ডিসেম্বর ২০২৪

বিজ্ঞান চিন্তা

বাংলার বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী

জৈব যৌগের গঠন পরমাণু খুঁড়তে গিয়ে

একজন কৃষকের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার কাহিনি

পেট্রোলিয়াম জেলি কীভাবে আর্দ্রতা রক্ষা করে

বিজ্ঞান রম্য, বিজ্ঞান কল্পগল্প, ছড়া, কমিক, কার্যকারণ

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

citytouch
DIGITAL BANKING

city bank™
making sense of money

ব্যাংকিংয়ের সব এক অ্যাপেই সম্ভব

সকল ব্যাংকিং সেবার ওয়ানস্টপ সল্যুশন সিটিটাচ। ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংকিং করতে পারবেন মাত্র কয়েকটা ট্যাপেই। তাই আজই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর সিটিটাচ অ্যাপ ডাউনলোড করে উপভোগ করুন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা। **সিটিটাচ হাতে, ব্যাংকিং সাথে সাথে।**

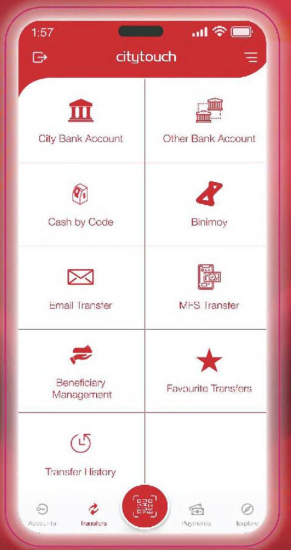

সিটিটাচ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

ডাউনলোড করুন

citytouch
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery
Available on the App Store

FCB1TOPI/24

ওয়ান্ডার কেক

ওয়াডারফুল ডে

প্রিয় বন্ধুরা,

শুভেচ্ছা নিও, আশা করি সবাই ভালো আছ। তোমাদের জন্য ওয়াডার কেক আবারও নিয়ে এলো **'ওয়াডারফুল ডে'** ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ম্যাজিক শো ও বিভিন্ন ধরনের এক্সাইটিং গেমস। পাশাপাশি থাকবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ওয়াডার কেক তো থাকছেই।

তাই আর দেরি কেন? পুরোটা দিন স্মরণীয় করে রাখতে তোমরা রেডি তো?

অংশগ্রহণের নিয়মাবলি:

১। অংশগ্রহণের জন্য ওয়াডার ককে ঘিরে তোমার আঁকা যেকোনো ছবি নিচে দেওয়া লিংক অনুযায়ী ফেসবুক পেজ অথবা গুগল ফর্মে তোমার নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা ও স্কুলের নামসহ তোমার অথবা অভিভাবকের আইডি থেকে শেয়ার করো।

২। তোমাদের পাঠানো ছবি থেকে আমরা সেরা ৫০০ জনকে নির্বাচিত করব।

৩। নির্বাচিত ৫০০ জন ওয়াডারফুল ডে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবে। নির্বাচিতদের তথ্য আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৪। ক্যাম্পেইনের দিনে থাকবে গ্র্যান্ড আর্ট কম্পিটিশন, ম্যাজিক শো ও বিভিন্ন ধরনের এক্সাইটিং গেমস।

৫। গ্র্যান্ড ফিনালে-তে বিজয়ীদের জন্য থাকবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ওয়াডার গিফট বক্স।

৬। ক্যাম্পেইন বিষয়ক সব তথ্য ওয়াডার কেক-এর ফেসবুক পেজে সরবরাহ করা হবে।

৭। যেকোনো প্রয়োজনে কল করো ০৮০০৭৭৭৭৭৭৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে।

তোমার আঁকা ছবি শেয়ার করতে

নিচের QR কোড স্ক্যান করে লগ ইন করো ওয়াডার কেক-এর ফেসবুক পেজে অথবা গুগল ফর্মে

https://www.facebook.com/WonderCake.BD

https://shorturl.at/MwdX0

Facebook

Google

বিশেষ দ্রষ্টব্য: গ্র্যান্ড আর্ট কম্পিটিশনের সব উপকরণ ওয়াডার কেক কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

ENVOY TEXTILES LIMITED

- **WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL**
- **FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY** IN BANGLADESH
- **FIRST ECO LAB** IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH **JEANOLOGIA**
- **11**-TIME WINNER OF **NATIONAL EXPORT TROPHY**
- WINNER OF **NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD**
- **3**-TIME WINNER OF **PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD**
- MULTIPLE-TIME WINNER OF **HIGHEST TAXPAYER AWARD**
- **2**-TIME WINNER OF **HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD**
- **LAB ACCREDITATION** BY RENOWNED BRANDS LIKE **LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, JCREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET,** etc.

amfori BSCI Trade with purpose
amfori BEPI Trade with purpose
OEKO TEX®
ROADMAP TO ZERO
GOTS - Global Organic Textile Standard
GRS - Global Recycled Standard
OCS - Organic Content Standard
RCS - Recycled Claim Standard
SOCIAL & LABOR CONVERGENCE
Powering to better cotton
COTTON USA™ THE COTTON THE WORLD TRUSTS
COTTON MADE IN AFRICA

EXPORTING WORLDWIDE

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS · Levi's · KONTOOR · INDITEX · UNIQLO · target
BESTSELLER · H&M · J.CREW · C&A · Calvin Klein · COTTON:ON
Walmart · vf · TESCO · GAP · Carrefour · s.Oliver
LC WAIKIKI · JCPenney · next · Kmart · RALPH LAUREN · UNITED COLORS OF BENETTON.

www.envoytextiles.com

বাংলার বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী

বাঙালি এক তরুণ অদ্ভুত এক পরীক্ষা দেখাচ্ছেন। একটা গাছ ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে। বিচিত্র এক যন্ত্রের মাধ্যমে গাছের সেই প্রতিক্রিয়া গ্রাফ আকারে উঠে আসছে কাগজে। ঠিক যেন কোনো মানুষের ইসিজি। যে তরুণ এই প্রদর্শনী করছেন, এতদিন সবাই তাঁকে চিনতেন পদার্থবিদ হিসেবে। তিনি প্রথম মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ উৎপাদন করেছেন। এখন তিনি পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগ করছেন জীবের ওপর।

এই তরুণের নাম জগদীশচন্দ্র বসু। শুধু তিনিই নয়, বাঙালির বিজ্ঞানাকাশে রয়েছেন এমন আরও অনেক নক্ষত্র।

বাঙাল মুলুক থেকে চিঠি এসেছে। চিঠির সঙ্গে এসেছে বাঙালি এক তরুণের গবেষণাপত্র। স্বয়ং আইনস্টাইন সেই চিঠি পেয়ে নড়ে-চড়ে বসলেন। নিজেই সেটা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে পাঠালেন প্রকাশের জন্য। সেই গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো। ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের নাম। মহাবিশ্বের অর্ধেক কণার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ব্যবহৃত হবে এটি। এই তরুণের নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

তাঁরই বন্ধু মেঘনাদ সাহা আবিষ্কার করছেন আয়নায়ন তত্ত্ব। সূর্যের মতো নক্ষত্রের বর্ণালিতে কোথায় কোন মৌল বা আয়নের চিহ্ন পাওয়া যাবে, তা জানা যাবে তাঁর আবিষ্কৃত সূত্র ব্যবহার করে।

ওদিকে ফাইনম্যান, হকিংদের মতো বড় বড় বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজের সুযোগ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন জামাল নজরুল ইসলাম। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক গাণিতিক ভিত্তি যাঁরা গড়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁদের একজন। জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান বই লেখার অগ্রপথিক।

এই চার বাঙালি বিজ্ঞানীকে নিয়েই এবারের মূল রচনা। বাঙালি তরুণেরা নতুনভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে চাইছেন। নতুন এ পথচলায় এই বিজ্ঞানীরা হতে পারেন অনুপ্রেরণা।

জাপানি পদার্থবিদ হিদেকি ইউকাওয়া মেসন কণার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথা কানে তুলল না। এক তরুণ বিজ্ঞানীর ফিরে আসার কাহিনি এটি। কৃষক থেকে বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন নূর মোহাম্মদ। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়েছেন কৃষক-বিজ্ঞানী সম্মেলনে। কৃষিপ্রধান দেশে তিনি আমাদের সবার অনুপ্রেরণা। জৈব যৌগের গঠন আঁকার পদ্ধতি নিয়েও রয়েছে একটি ফিচার। শীতকালে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেন প্রায় সবাই। এই রাসায়নিক কীভাবে আর্দ্র রাখে ত্বক? জানতে পারবেন এ সংখ্যায়। এরকম নানা স্বাদের রচনার পাশাপাশি রয়েছে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি, বিজ্ঞান রম্য, ছড়া, বইপত্র, কুইজ, তিনটি কমিকসসহ আরও অনেক কিছু।

সামনে বড়দিন আসন্ন। বাংলাদেশের সব খ্রিস্ট ধর্মালম্বীদের জানাই বড়দিনের শুভেচ্ছা।

বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে থাকুন, সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকুন। গড়ে তুলুন সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ।

বিজ্ঞানচিন্তা

ডিসেম্বর ২০২৪
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১
বর্ষ ৯ সংখ্যা ০৩
পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক
আব্দুল কাইয়ুম

উপদেষ্টা পরিষদ
ড. রেজাউর রহমান
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ
ড. আরশাদ মোমেন
ড. মাহবুব মজুমদার
মুনির হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
আবুল বাসার

সহসম্পাদক
উচ্ছ্বাস তৌসিফ
কাজী আকাশ

বিশেষ সহযোগী
রাজীব হাসান

সম্পাদনা দল
ইবরাহিম মুদ্দাসসের

ম্যাগাজিন সমন্বয়ক
শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. মহিউদ্দিন রওনক

শিল্প নির্দেশনা
সৈয়দ লতিফ হোসাইন

ডিজাইন
মো. শামীম আলী

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

প্রচ্ছদ : আরাফাত করিম

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে সহযোগিতায়

সিটি ব্যাংক™

প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : বিজ্ঞানচিন্তা, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।
ওয়েবসাইট : bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : facebook.com/Bigganchinta

পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সূচিপত্র

মলাট কাহিনি

জামাল নজরুল ইসলাম কেন বিশ্বখ্যাত? কী নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি? কেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু ও জগদীশচন্দ্র? শুধু বাঙালি নয়, বিশ্বের সেরা এই চার বিজ্ঞানীর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক জীবন আমাদের গর্ব, আমাদের অনুপ্রেরণা। বিজ্ঞানচিন্তার এ সংখ্যায় জানতে পারবেন তাঁদের গবেষণা জীবনের সেই অজানা অধ্যায়।

জগদীশচন্দ্র বসু : নক্ষত্রের চোখের বিস্ময় ১৪
উচ্ছ্বাস তৌসিফ

মেঘনাদ সাহা : নক্ষত্রের জীবন যাঁর ২২
অমিতাভ চক্রবর্তী

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : আলোর স্বরূপ সন্ধানে ২৮
দীপেন ভট্টাচার্য

জামাল নজরুল ইসলাম : মহাবিশ্বের নিয়তির সন্ধানে ৩৪
প্রদীপ দেব

একনজরে জগদীশচন্দ্র বসু ২১

একনজরে মেঘনাদ সাহা ২৭

একনজরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৩৩

একনজরে জামাল নজরুল ইসলাম ৪১

বিজ্ঞান কল্পগল্প

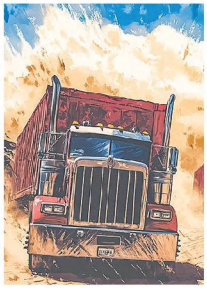

নিষিদ্ধ ইতিহাস
ডিউক জন **৬৬**

নিউ মেক্সিকোর রসওয়েল শহরের ৭৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জায়গাটি। ১০ জুলাই, ১৯৪৭। ঝোড়ো বাতাস গুলিবর্ষণের মতো আঘাত হানছে মানুষটির মুখ আর উন্মুক্ত হাত দুটোয়। হ্যাটটা শক্ত করে মাথার সঙ্গে চেপে ধরে ট্রাক থেকে ট্রাকে ছুটছেন তাগড়া লোকটি। যত জোরে সম্ভব, চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছেন চালকদের। কিন্তু বাতাস উড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তাঁর কথাগুলো...

বিজ্ঞান রম্য

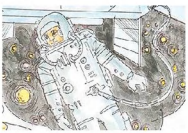

শূন্য
আহসান হাবীব **১১**

ছেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখে, বাবা বারান্দায় বসে পেপার পড়ছেন। ছেলেকে দেখে বাবা বললেন, 'কী খবর, কিছু বলবে?' হ্যাঁ। আচ্ছা বাবা, শূন্য কে আবিষ্কার করেছিল?

RUPAYAN
CITY UTTARA
RUPAYAN
Grand
সম্পূর্ণ রেডি
RUPAYAN
CITY
First City Brand in Bangladesh
RUPAYAN
CITY UTTARA
A Premium Mega Gated Community
RUPAYAN
GRAND
- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের একমাত্র গেটেড কমিউনিটি
- চমৎকার আন্ডারগ্রাউন্ড সুইমিংপুল
- কোর্টইয়ার্ড সাথে কমিউনিটি কফি শপ
- জিম, সুইমিংপুল ও কমিউনিটি শপ
- HANSA হানসা-এর মাধ্যমে ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট
- প্রায় ১৫০ বিঘা সিটি এরিয়া
- ৩ স্তর এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- গাজিবো ও এম্ফিথিয়েটার
- ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
- সেন্ট্রাল এলপিজি গ্যাস চেম্বার
- ৬৩% খোলা জায়গা
- কমিউনিটি ক্লাব
- স্কুল ও মসজিদ
- চমৎকার ওয়াটার বডি
- ৬.৫ কিমি জগিং ট্রেক
৩৮৫+ পরিবার এখনই বসবাস করছেন
সীমিত সংখ্যক ইউনিট ২৩০০sft. - ৩০৭০sft.
www.rupayancity.com
HAPPY TO SERVE YOU 16504 017 0122 3644
রূপায়ন সিটি উত্তরা থেকে -
মেট্রোরেল স্টেশন: দূরত্ব-৫০০ মিটার, সময়-০৫ মিনিট (হাঁটার দূরত্ব)
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর: দূরত্ব-৬.৫ কিমি, সময়-১২ মিনিট
বিআরটি স্টেশন: দূরত্ব-৮৫০ মিটার, সময়-১০ মিনিট (হাঁটার দূরত্ব)
এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: দূরত্ব-০৭ কিমি, সময়-১৫ মিনিট

সূচিপত্র

ফিচার

জৈব যৌগের গঠন কীভাবে আঁকবে
রউফুল আলম ৫৬

পরমাণু খুঁড়তে গিয়ে
আবুল বাসার ৬০

একজন কৃষকের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার কাহিনি
আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ ৬৮

পেট্রোলিয়াম জেলি কীভাবে আর্দ্রতা রক্ষা করে
আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ ৭৪

বিজ্ঞান কমিক
৪২, ৪৪, ৪৮

সাক্ষাৎকার

মানবিক বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে ওঠো
—হাসান খুরশীদ রুমী
বিজ্ঞান কল্পগল্প লেখক ও অনুবাদক ৫২

রকমারি বিজ্ঞান

গণিতের অধ্যাপক কোথায় গবেষণা করেন ৭১
শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে কেন ৭২

বিজ্ঞান ছড়া

লেজ
রোমেন রায়হান ১৩

নিয়মিত বিভাগ

ডাকবাক্স ৮
গণিতের সমস্যা ৩২
দুই চালে মাত ৪০
বিজ্ঞানায়োজন ৫১, ৫৮, ৭০, ৭৫
বইপত্র ৫৯
কার্যকারণ ৭৬
প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান ৭৭
সুডোকু ৭৭
গণিতের কুইজ ৭৮
কুইজ ৭৯

বাংলাদেশের Gen Z বিশ্বাস করে সব সম্ভব

শত তরুণের
জীবন জয়ের গল্প

মূল্য ~~৫০০~~ টাকা
২৫০ টাকা
(সীমিত সময়ের জন্যে)

ফ্রি ডাউনলোড

অনলাইনে
ফ্রি পড়ুন

পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন

quantummethod.org.bd

আট বছরে বিজ্ঞানচিন্তা

'মাথায় কত প্রশ্ন আসে' 'টাইম ট্রাভেল কি সম্ভব' 'মহাবিশ্বের রহস্য' ও 'জীবন রহস্যের ভাষা' নিয়ে তখন 'সুদূর ভবিষ্যতের দূরদ্রষ্টা' হিসেবে হাজির বিজ্ঞানচিন্তা। যেমন 'চ্যাটজিপিটি সব জানে', বিজ্ঞানচিন্তাও তেমনি সব জানে। বিজ্ঞানচিন্তাই কেবল বলে, 'আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু' ও 'মেঘনাদ সাহার অন্য ভুবন'-এ সবই সম্ভব। 'বৈরী আবহাওয়া' কিংবা 'এলিয়েনের খোঁজে' বিজ্ঞানচিন্তাই আমাদের 'ভাষা ও বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানচিন্তার কাছে 'জীবনের জন্য বিজ্ঞান' মানেই 'ফুটবলের বিজ্ঞান', 'করোনার বিজ্ঞান' আর 'ন্যানো প্রযুক্তি'। 'জেমস ওয়েব' যখন 'সৌরজগতের সীমা পেরিয়ে' 'বিগ ব্যাংয়ের আরও কাছে', বিজ্ঞানচিন্তা তখন তার 'বিস্ময়কর মানবমস্তিষ্ক' নিয়ে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার'-এর গতিতে সব তথ্য তুলে ধরছে। 'মহাকাশ জয়ের নতুন অধ্যায়'-এর সূচনালগ্নে বিজ্ঞানচিন্তার হাত ধরেই 'আমাদের বিজ্ঞান উৎসব'-গুলো থেকে তৈরি হচ্ছে 'সেরা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন' কিংবা 'আমাদের সত্যেন বসু'। ভবিষ্যতে যারা 'মহাশূন্যে গবেষণাগার'-এ বসে 'কোয়ান্টামের অদ্ভুত জগৎ'-এ প্রবেশ করে পৌঁছে যাবে 'কৃষ্ণগহ্বরের আরও কাছে'। একদিন হয়তো তারাই বিজ্ঞানচিন্তার সাক্ষাৎকারে খুলে বলবে 'ফোটনের অদ্ভুত কাহিনি' কিংবা 'উল্কাপাত কতটা বিপজ্জনক'। তাদের হাত ধরেই তৈরি হবে 'আমাদের পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র', দূর হবে 'আমাদের সুন্দরবন'-এর 'জলবায়ুতে অশনিসংকেত'। যার পেছনে কেবল থাকবে বিজ্ঞানচিন্তা। 'বিজ্ঞানের নোবেল ২০২৪' আমাদের না হলেও তাদের কারণেই 'বিজ্ঞানের নোবেল ২০২৫' হয়তো আমাদের হবে। তখন বিজ্ঞানচিন্তাকেই সগৌরব লিখতে হবে 'বিজ্ঞানের নোবেলে বাংলাদেশ'।

আবদুল্লাহ আল মাহীদ, দশম শ্রেণি, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ

প্রিয় বিজ্ঞানচিন্তা

শুরুতে বিজয়ের মাসে একরাশ লাল-সবুজ শুভেচ্ছা নিয়ো। দেশে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, তারপর নতুন শিক্ষাক্রমের পরীক্ষাপদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন—সব মিলিয়ে অনেকটা নাজেহাল আর ব্যস্ত সময় পার করছি। যে বইগুলোকে মনে করতাম অনুসন্ধান আর মাঠের কাজনির্ভর, লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সেগুলোই নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। এত কিছুর ফলে প্রায় চার মাস ধরে তোমাকে পড়ার ফুরসত পাচ্ছি না। কিন্তু তোমার সব কটি সংখ্যাই আমার সংগ্রহে আছে।

এর মধ্যে আবার শুরু হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। আজ বিজ্ঞান পরীক্ষাটা দিয়ে এলাম। জানলে খুব খুশি হবে নিশ্চয়ই, সব কটি পরীক্ষার চেয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষাটাই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো হয়েছে। তোমার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে ধার করা তথ্য আর লেখার ভাষাও আমার উত্তরপত্রে কাজে লেগেছে বেশ! সে জন্য ধন্যবাদ। এ ছাড়া লেখক-পাঠকসহ বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ একসঙ্গে একটা বছর শেষ করার জন্য। কেননা এই ডিসেম্বরেই বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে আমার এক বছর পূর্ণ হলো। দোয়া কোরো যেন আগামী দিনগুলোতেও আমরা এভাবে এক 'পরিবার' হয়ে থাকতে পারি।

অষ্টম শ্রেণির পরিচয়ে এটাই হয়তো তোমার কাছে আমার শেষ লেখা। তুমি চাইলে তোমার পৃষ্ঠায় স্থান দিতে পারো। ঠিক করেছি, নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখাই নেব। আশা করি, আমার এই যাত্রায়ও তুমি একজন অতুলনীয় সহযাত্রী হয়ে আমার, আমাদের সবার পাশে থাকবে। অনেক অনেক শুভকামনা রইল তোমার জন্য, প্রিয় বন্ধু।

নাজমুল হাসান রাফসান, অষ্টম শ্রেণি, আব্দুল আজিজ উচ্চবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে দুই বছর

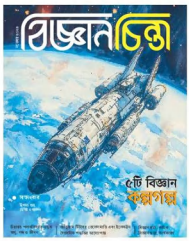

এ সংখ্যা দিয়ে আমার সঙ্গে তোমার দুই বছরের সম্পর্ক তৈরি হলো। আমার কাছে এ পর্যন্ত ২৩টি সংখ্যা আছে, এ বছরের অক্টোবরের সংখ্যা ছাড়া। সেটিও কেনার চেষ্টা করব। চিঠির উত্তর দেওয়ার সিস্টেম কি করা যায়? এই দুই বছরে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এবারের কল্পগল্প সংখ্যাটা ছিল দারুণ। 'কিডন্যাপ' ও 'পিঁপড়ে, পিঁপড়ে' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমার জন্মদিন অক্টোবরে, আমার জন্মদিনও অক্টোবরে। শুধু পার্থক্য হলো, তোমার বয়স ৮ বছর আর আমার বয়স ১৩। কিন্তু তুমি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখো। 'টাইম ট্রাভেল কি সম্ভব' সংখ্যাটি এ বছরের সবচেয়ে সেরা সংখ্যা। এ থেকে আমি তত্ত্ব ও বিজ্ঞান শিখতে পেরেছি। ইলেকট্রনিক নিয়ে একটি সংখ্যা করার আবেদন রইল। আজকে আর নয়। আমারটা অন্তত ছেপে দিয়ো।

আফরা আরিবা আরিশা, সপ্তম শ্রেণি, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

কল্পগল্প সংখ্যাটা চমকপ্রদ হয়েছে

কেমন আছ? আশা করি, ভালো আছ। আমিও ভালো আছি। ছোট থেকেই আমি বিজ্ঞানের লেখা পড়তে খুব পছন্দ করি। তাই তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ম্যাগাজিন। এবারের কল্পগল্প সংখ্যাটা খুব চমকপ্রদ। আমি বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান কুইজে অংশ নিয়েছিলাম। তবে লটারিতে আমার নাম ছিল না। এর পরেরবার হয়তো হবে। আমার বাবা বিভিন্ন ম্যাগাজিনের নাম জানত। যেমন তুমি। বাবা প্রথম যখন আগস্টের সংখ্যা নিয়ে এল, তখন দেখে খুবই ভালো লাগল। এর পর থেকে আমি তোমার নিয়মিত পাঠক। তবে মাঝে অক্টোবরের সংখ্যাটা পড়া হয়নি। সেটাও কিনে পড়ার চেষ্টা করব। প্রথম দিকে আমার লেখাপড়ার প্রতি খুব একটা মনোযোগ ছিল না, কিন্তু তোমাকে পড়ে আমি নানা কিছু জানতে পেরেছি। 'কিডন্যাপ' গল্পটা খুবই দারুণ! এখন এ পর্যন্তই। গুডবাই।

আহনাফ আবরার আনান, পঞ্চম শ্রেণি, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল

প্রিয় বিজ্ঞানচিন্তা

বলতে পারো, আমি তোমার নতুন পাঠক হিসেবে যুক্ত হয়েছি। আমি যখন খাতা কিনতে গিয়েছিলাম, তখন বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিন প্রথম দেখলাম। যেহেতু বিজ্ঞান খুব ভালোবাসি, তাই বিজ্ঞানচিন্তা দেখে খুব আগ্রহ হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার কাছে তখন ছিল মাত্র ৫০ টাকা। ১০ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে যেতে হবে। রাস্তাটাও অনেক। কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। তবে বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে একবার পড়ে দেখার পর আর রেখে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাই ম্যাগাজিনটা না নিয়ে আর পারলাম না। এরপর পুরো রাস্তা আমি হেঁটে বাসায় আসি। বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশিত হয় প্রতি মাসে। কিন্তু একবার পড়ে মনে হতে থাকে যে যদি প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতো, তাহলে আরও ভালো হতো। তাই প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়ে শেষ হলে অপেক্ষায় থাকি আবার কখন মাস শেষ হবে এবং আমি নতুন

বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিনটি কিনব। ধন্যবাদ।
জহির উদ্দিন মো. অনিক, দ্বাদশ শ্রেণি, ময়মনসিংহ

পাঠকের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানচিন্তা

একজন পাঠকের কাছে, পছন্দনীয় মাসিক পত্রিকায় স্থান পেতে হলে অব্যশই সেই ম্যাগাজিনকে কিছু সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। লেখনীর মধ্যে থাকতে হবে অনন্যতা। বিজ্ঞানচিন্তার মধ্যে একজন পাঠক হিসেবে আমি সেই জিনিসটি খুঁজে পেয়েছি। এখানে আরও কিছু বিবেচ্য বিষয় থাকে, যেমন লেখক-পাঠকের মধ্যে কানেকশন, প্রতিবার কোনো নির্দিষ্ট একটি থিম নিয়ে লেখা সাজানো, নতুনত্ব আনয়ন ইত্যাদি। এসব বিষয় পেয়েছি আমি তোমার মধ্যে। এ ছাড়া তোমার লেখনীগুলো এমনভাবে তথ্যবহুল হয় এবং তথ্যগুলো এমনভাবে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, যেকোনো বয়সের নতুন পাঠক, পুরোনো পাঠক, এমনকি এমন ব্যক্তি, যার ওই বিষয়ের ওপর কোনো ধারণাও নেই, সে-ও খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে তোমার সব লেখনী। আবার সব ধরনের মানুষ সব থিম পছন্দ করেন না। এমনও হয় যে কারও রসায়ন পছন্দ আবার কারও বিজ্ঞানের অন্য কোনো দিক। অনেকের আবার পড়তে পড়তে বিরক্ত হওয়ার ব্যাপার থাকে। তাই তো তোমার লেখায় নির্দিষ্ট একটি থিম নিয়ে লেখা থাকলেও বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর লেখাও থাকে। আবার পড়তে পড়তে যাতে কেউ বিরক্ত না হয়, তাই তোমার মধ্যে সংযোজন করা হয় বুদ্ধির খেলা, সুডোকু, কুইজ ও কমিকস। আবার পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার ক্ষেত্রে তুমিই সেরা। সত্যি বলছি, তোমার পাঠক হওয়ার আগে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল না আমার। তোমার মান অনেক ভালো, আবার দামটা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ তুমি সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য সহজলভ্য। এত কিছু বিবেচনার পর আমার মাথায় একটাই প্রশ্ন—একটা সংখ্যা বের করতে না জানি তোমার লেখকদের কত কষ্ট করতে হয়!
মো. সাদিক আল মুবীন, নীলফামারী পৌরসভা, নীলফামারী

শুধু নামে নয়, ভেতরেও সুন্দর

বিজ্ঞানচিন্তা নামটাই কী চমৎকার, তাই না? বিজ্ঞানচিন্তার শুধু নামটাই যে সুন্দর, তা কে বলেছে! বিজ্ঞানচিন্তার ভেতরের প্রতিটি পাতায় রয়েছে বিজ্ঞানের চমৎকার সব কথা, যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। বিজ্ঞানচিন্তার বইগুলো একটি আরেকটির চেয়ে সুন্দর। আমরা যে জীবনের প্রতিটি কাজে বিজ্ঞান ব্যবহার করি, সেটা বিজ্ঞানচিন্তা না পড়লে বোঝা যাবে না। এ ছাড়া বিজ্ঞানচিন্তা প্রতি মাসে অনেক বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার নেয়। সাক্ষাৎকারের মধ্যেও কিন্তু বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিনটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান দিয়ে ভরা। এটা না পড়লে তা বোঝা যায় না। আশা করি, ভবিষ্যতে আমাদের এই বিজ্ঞানচিন্তা আরও বেশি বিজ্ঞানবিষয়ক হবে। শুভকামনা বিজ্ঞানচিন্তাকে।
তানজিম মাহফুজ রাফি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর

আসলেই অসাধারণ তুমি!

শুভ জন্মদিন! যদিও খুব দেরিতে আমার চিঠি তোমার কাছে পৌঁছাবে বা পৌঁছালেও আমার লেখা আদৌ পরের সংখ্যায় ছাপা হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবু শুভেচ্ছা। পরীক্ষার খাতায় তো অনেক লিখেছি, তবে এটা আমার লেখা প্রথম বাস্তব চিঠি। অনেক দিন ধরে তোমার কাছে লেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু লেখা হয়নি। ভাবলাম, অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীই আমার সুযোগ। আসলে এ বছরের শুরু থেকেই আমি তোমার পাশে আছি, তোমার প্রতি মাসের নতুন রূপের প্রেমে পড়েছি। এবারের সংখ্যাটির রূপ দেখেও কোনো কমতি মনে হয়নি। একেবারেই মুগ্ধ। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে টানা এক মিনিট তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এত সুন্দর কীভাবে হতে পারে কোনো ম্যাগাজিন? যা-ই হোক, বছরের শুরুর দিকে শুধু তোমার রূপ দেখেই ফেলে রাখতাম টেবিলের এক কোণে। ভেতরের জ্ঞানটা বেশি নেওয়া হতো না। তবে জুলাই-আগস্টের টানা অনেক দিন বন্ধ এবং ইন্টারনেটের অনুপস্থিতিতে তোমাকে শেষমেশ টেবিলের ওই কোণ থেকে হাতে তুলে নিই। আর বাকিটা...ইতিহাস।
নিলুফার ইয়াসমিন শেফা, যশোর কালেক্টরেট স্কুল, যশোর

একজন হার্ট সার্জনের সাক্ষাৎকার চাই

একটু একটু হিমেল শীত কেমন লাগছে তোমার কাছে? আগামী বছর আমার প্রায় এক যুগ শিক্ষাজীবনের সমাপ্তির বিশেষ পরীক্ষা। তাই আমার তত অনুভব করার ঠিক সময় নেই হাতে। আর না আছে তোমাকে ঠিকঠাক পড়ে ফেলার সময়। তবু লুকিয়ে-চুরিয়ে যেটুকু পড়তে পারি। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের ১১ মাস হলো সবে। তবে এর মধ্যেই তুমি আমার ও আমার সহোদরদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠেছ। প্রতি মাসের মাঝামাঝি তোমার আগমনের অপেক্ষায় থাকি।

দুঃখ হয়, আগে কেন তোমার খোঁজ পেলাম না। তবে আগের সংখ্যাগুলো সংগ্রহের চেষ্টায় আছি অবশ্য। গতবার তোমার জন্মদিনের কুইজে আমি পুরস্কারও পেয়েছিলাম, যা আমার কাছে ছিল হিরে পাওয়ার মতো আনন্দময়। তোমার প্রতিটি ফিচার আমার ভীষণ প্রিয়। নভেম্বর সংখ্যাটাও দারুণ হয়েছে। বেশি ভালো লেগেছে ডা. উপমা গুহর সাক্ষাৎকার। আমারও বড় একটা স্বপ্ন পারফেক্ট হার্ট সার্জন ও কার্ডিওলজিস্ট হওয়া। এখনো না ছোঁয়া স্বপ্ন আমার! তোমার কাছে একটা অনুরোধ, দয়া করে একজন বিখ্যাত হার্ট সার্জনের সাক্ষাৎকার নিয়ো। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ! আশা করছি, আমার অনুরোধটা ভেবে দেখবে।
তানজিলা অঙ্কুর, দশম শ্রেণি, এমডিসি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

ই-মেইল থেকে

তুমি বাংলাদেশের হাজারো কিশোর-কিশোরীর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। তোমার উপকার আমরা কোনো দিনও ভুলতে পারব না।
বর্ষন বিশ্বাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুল

বিজ্ঞানচিন্তা আমার প্রিয় ম্যাগাজিন। আমি বিজ্ঞানচিন্তার একজন সদ্য পাঠক। এটি আমার বিজ্ঞান শেখার জন্য এক অনন্য প্রকাশনা। আমি একজন বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষ। বিজ্ঞান শিখতে আমার খুব ভালো লাগে। বিজ্ঞানচিন্তার অক্টোবর সংখ্যাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম স্নায়ুতন্ত্র ও যন্ত্রের লেখাপড়া। বিজ্ঞানচিন্তার ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি।
তারেক মিয়াজী, অষ্টম শ্রেণি, কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা

আমাদের লিখুন

বিজ্ঞানচিন্তা
১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
ওয়েবসাইট : www.bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : fb/Bigganchinta

বিজ্ঞানবাক্স

বিজয় মেলা

বিজয়ের মাসে বিজ্ঞানবাক্স কেনো বছরের সেরা ডিসকাউন্টে!

অনলাইনে ১টি বিজ্ঞানবাক্স কিনলে ৫%
২টি কিনলে ১০% ডিসকাউন্ট

অফারটি চলবে ১০-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

*শর্ত প্রযোজ্য

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

স্বপ্ন | meena bazar bringing freshness to your life | রকমারি.com www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

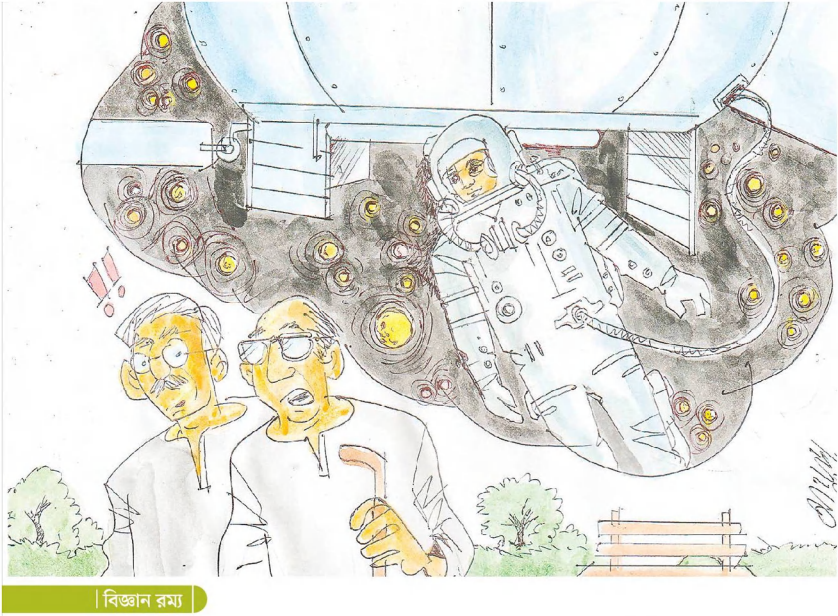

বিজ্ঞান রম্য

শূন্য

আহসান হাবীব

ছেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখে, বাবা বারান্দায় বসে পেপার পড়ছেন। ছেলেকে দেখে বাবা বললেন, 'কী খবর, কিছু বলবে?'

হ্যাঁ। আচ্ছা বাবা, শূন্য কে আবিষ্কার করেছিল? ছেলের প্রশ্নে বাবা খুশি হলেন।

ভেরি গুড। এ ধরনের প্রশ্ন করবে। তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবে। প্রশ্ন না করলে আমরা শিখব কোথা থেকে? হ্যাঁ, তাহলে বলি, এটা খুবই গর্বের ব্যাপার যে শূন্যের আবিষ্কার হয়েছে আমাদের এই উপমহাদেশে।

যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর নাম কী?

তাঁর নাম আর্যভট্ট। মনে রেখো, নামটিকে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে সব সময়। প্রাতঃস্মরণীয় একটি নাম। চিন্তা করতে পারো, আগে শূন্য ছাড়াই আমাদের সব ধরনের হিসাব-নিকাশ করতে হতো! মহান আর্যভট্টই প্রথম শূন্য এনে এর সমাধান দেন।

তার মানে তো বাবা, শূন্য খুবই জরুরি একটা সংখ্যা।

অবশ্যই। এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে সংখ্যা হচ্ছে বিজ্ঞানের ভাষা। আর শূন্য হচ্ছে সেই ভাষার শুরু...

ইয়ে, বাবা, তাহলে এটাতে একটু সই করে দাও তো।

ছেলে একটা কাগজ বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল। বাবা কাগজটা হাতে নিয়ে দেখেন, ছেলের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড। বিজ্ঞানসহ তিন বিষয়ে সে শূন্য পেয়েছে। কী আর করা! বাবা বিষণ্ন বদনে সেই রিপোর্ট কার্ডে সই করলেন।

বাবা কাগজটা হাতে নিয়ে দেখেন, ছেলের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড। বিজ্ঞানসহ তিন বিষয়ে সে শূন্য পেয়েছে

এরপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সেই যে রূপসী বাংলার বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায়, 'নক্ষত্রের বেগে যদিও ছুটেছে সময়...২৫ বছর তবু কই শেষ হয়?' কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের পঁচিশ বছর কিন্তু শেষ হয়েছে। সেই শূন্য পাওয়া ছেলের বাবাও বৃদ্ধ হয়েছেন। বিকেলের দিকে লাঠি হাতে পার্কে হাঁটাহাঁটি করেন।

তো, তিনি একদিন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে পার্কে হাঁটছেন। দুজনই বৃদ্ধ। বৃদ্ধ বন্ধু প্রশ্ন করলেন,

আচ্ছা, তোমার ছেলেটি কী করে এখন?

কোন ছেলেটা? আমার তো দুই ছেলে, কার কথা বলছ?

ওই যে, যে ছেলে পরীক্ষায় শূন্য পেত আর তুমি মন খারাপ করতে...

শূন্য পাওয়া ছেলের বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, হ্যাঁ, আমার শূন্য পাওয়া ছেলে এখন...মহাশূন্যে।

মানে?

সে এখন 'অ্যাস্ট্রোনট'। নাসা থেকে মহাকাশে গেছে গত বছর।

লেখক : রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট; সম্পাদক, উদ্ভাস

সারা বছর সেরা বই

নতুন বই

৳ ৩০০.০০

ঝটপট গণিত

সহজ কলাকৌশল

কাজী আকাশ

হিসাব-নিকাশ ছাড়া আমরা এক দিনও চলতে পারি না। শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে চাকরিপ্রার্থী বা ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য কথাটা আরও বেশি প্রযোজ্য। তাই এ বই সবার জন্য। এক মাস পরে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সমাধান করা যাবে নিমেষে।

আরও বিজ্ঞান ও গণিতের বই

আবুল বাসার
- **আবিষ্কারের কাহিনি** ৳ ৪০০

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী
- **এক্সোপ্ল্যানেট** বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে ৳ ৪২০

ওয়াল্টার লুইন
ভাষান্তর : আবুল বাসার
- **ফর দ্য লাভ অব ফিজিকস** ৳ ৬৮৫

নাফিস তিহাম, সংকলন ও পরিমার্জন
- **বাংলাদেশে** গণিত অলিম্পিয়াডের যত প্রশ্ন ৳ ৬০০

শিশিরকুমার ভট্টাচার্য
- **আইনস্টাইনের জীবন ও আপেক্ষিক তত্ত্ব** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৪০০

রিচার্ড ফাইনম্যান
অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ
- **সিক্স ইজি পিসেস** ৪র্থ মুদ্রণ ৳ ৪০০

আব্দুল কাইয়ুম
- **আরও গণিত আরও স্মার্ট** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩৪০
- **গণিত আর গণিত** ২য় মুদ্রণ ৳ ৩২০
- **গণিতের জাদু** ১২তম মুদ্রণ ৳ ৪০০
- **গণিতের ধাঁধা** ৫ম মুদ্রণ ৳ ৩০০
- **বিজ্ঞানের রাজ্যে কেন কেন এবং কেন** ৳ ৩৮০
- **প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞানের কী ও কেন** ২য় মুদ্রণ ৳ ৩৫০
- **মজার গণিত** ৫ম মুদ্রণ ৳ ২৯০
- **সরস গণিত** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩০০

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী
- **অঙ্ক ও মেজোকাকুর হেঁয়ালি** ৳ ৩৫০

নাফিস তিহাম
- **গণিত অলিম্পিয়াড** ১০১ সমস্যা ও সমাধান ৭ম মুদ্রণ ৳ ২৮০

কাজী আকাশ
- **গণিতের খেলা গণিতের মজা** ৳ ২৫০

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন

www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

প্রথমা প্রকাশন

● ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭ ●৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৬ ●শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা। ০১৭৩০ ০০০৬০০ ●মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩০ ০০০৬৪৮ ●ইউনিমার্ট বিল্ডিং, আম্বরখানা, সিলেট। ০১৭০৮ ৪৩৫৫৭৯

লেজ

রোমেন রায়হান

পড়াশোনায় নেই মনোযোগ তাই বোঝো না, বুঝছ?
একে-ওকে বলতে শোনো লাঙ্গুর, লেঙ্গুড়, পুচ্ছ!
শুনেই পড়ো আকাশ থেকে? তারপরে হও জব্দ?
আরে বাবা! এসব হলো লেজের প্রতিশব্দ!

লেজ চেনো তো? প্রাণিদেহের শেষ, পেছনের অঙ্গ!
আলাপ শুরুর আগেই কেন দিচ্ছ রণে ভঙ্গ?
জ্ঞানের কথা শুনলে কি লস? বাড়াও জ্ঞানের গণ্ডি
লেজ মূলত তাদের থাকে যারা মেরুদণ্ডী!
পাখি, সরীসৃপের থাকে, পান করে যে স্তন্য
লেজের কোটা বরাদ্দ হয় প্রায় সকলের জন্য!
শুধু মেরুদণ্ডী তো নয় (কাটছ মিছে চুগলি)
লেজের মালিক বিছে, শামুক, কয়েক জাতের গুগলি!

লেজ মোটে নয় হালকা বিষয়, বুঝবে চালাকমাত্রে
লেজ দিয়ে দিক ঠিক করে মাছ বেড়ায় জলে সাঁতরে!
মাছের মতন পাখির লেজও ঠিক করে দেয় দিককে!
তাতেই পাখি ইচ্ছামতন উড়ছে অন্তরীক্ষে!
পুরুষ পাখি লেজ নাড়িয়ে মুগ্ধ রাখে সঙ্গী
শুনবে আরো? সহজ করো গোমড়া মুখের ভঙ্গি!

বিড়াল, ক্যাঙারুরা লেজে ঠিক রাখে ভারসাম্য
সত্যি, লেজের জন্য বিশেষ সম্মাননা কাম্য!
এই যে! কেন লেজ বিষয়ে লিখবে কয়েক ছত্র!
লেজে বানর, হনুমানে ধরে জিনিসপত্র!
মায়ের লেজে ধরে ঘোরে হাতির ছোট বাচ্চা
দেখলে কোথায়? টিভির ভেতর! আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!

সারাক্ষণই রাখলে খোলা চক্ষু এবং কর্ণ
বুঝবে আমার লেজের আলাপ মিথ্যা না এক বর্ণ!
শাবকগুলো শিকার শেখায় যখন অনেক ব্যগ্র
লেজ নাড়িয়ে ট্রেনিংটা দেয় সিংহ এবং ব্যাঘ্র!
কাঠবিড়ালের লেজ-কম্বল শীত তাড়ানোর শক্তি
লেজের ভাষায় কুকুরগুলো দেখায় প্রভুভক্তি!

ব্যাঙাচিদের লেজ থাকলেও ব্যাঙের বেলায় লুপ্ত
টিকটিকিদের লেজের আসল রহস্যটা গুপ্ত!
টিকটিকি লেজ খসায় বলে শিকারি বিভ্রান্ত!
লেজের আলাপ শুনতে গিয়ে হচ্ছ নাকি ক্লান্ত?

এই কারণেই জ্ঞান বাড়ে না, লেজকে ভাবো তুচ্ছ?
মুফতে বলে যাচ্ছি দেখে দাম দিলে না, বুঝছ?

অলংকরণ : **রাকিব**

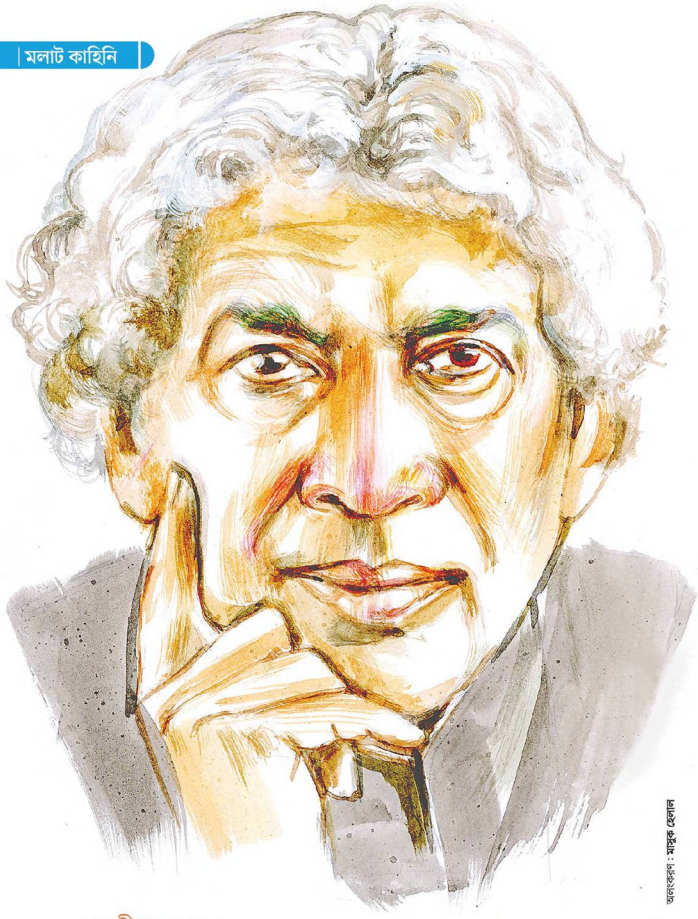

অলংকরণ : মাসুক হোসেন

জগদীশচন্দ্র বসু

নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়

ইতিহাসের প্রথম জীবপদার্থবিদ বলা যায় তাঁকে। মাইক্রোওয়েভ ও সলিড-স্টেট ফিজিকসে ছিলেন অগ্রপথিক। অথচ বিপন্ন বিস্ময়ে সরে এলেন পদার্থবিদ্যার জগৎ থেকে, জানতে চাইলেন সবুজের মনের বেদনা—এভাবে বিজ্ঞানের সীমা পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন দার্শনিক; কিংবা বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ভেতর রচনা করলেন এক অদ্ভুত সেতু...

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

গাছেরও প্রাণ আছে—কথাটা কার?

কেন, জগদীশচন্দ্র বসুর! এটাই হয়তো ভাবছেন আপনি।

বিজ্ঞানী ভাবলেই হয়তো আলবার্ট আইনস্টাইনের ছবি ভেসে ওঠে আপনার চোখে। কিন্তু 'বাঙালি বিজ্ঞানী' বললে কার ছবি ভেসে ওঠে মনে? এ প্রশ্নে কেউ হয়তো সত্যেন বসুর নাম বলতে পারেন, কেউবা বলতে পারেন কুদরাত-এ-খুদা বা জামাল নজরুল ইসলামের কথা। কিন্তু এই সংখ্যাটা বোধ হয় খুব কম। এই লেখার আগে একটা ছোটখাটো জরিপ করেছি আমি। তাতে বেশির ভাগের কাছে (৮০ শতাংশের বেশি হবে) উত্তর পেয়েছি—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন : জগদীশচন্দ্র বসু।

এবার একটু আপনাকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। 'গাছেরও প্রাণ আছে'—জগদীশচন্দ্র একজীবনে কখনোই ঠিক এ কথাটি বলেননি। (কী বলেছেন, সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি।) লেখক, গবেষক প্রদীপ দেব তাঁর *সবার জন্য জগদীশচন্দ্র বসু* বইতে লিখেছেন, তিনি পৃথিবীর প্রথম 'জীবপদার্থবিজ্ঞানী'। অর্থাৎ বায়োফিজিসিস্ট। *ডিকশনারি অব সায়েন্টিফিক বায়োগ্রাফি* বইতে চার্লস সাসকিন্ড একদম তথ্যপ্রমাণসহ এটি দেখিয়েছেন। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির আলাদা কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তবে আজকের প্রচলিত ধারার জীবপদার্থবিদ তাঁকে বলা যায় না। জগদীশচন্দ্র আসলে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে বুঝতে চেয়েছেন। জানতে চেয়েছেন প্রকৃতির নাড়ির খবর। এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন তিনি। অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক আহমাদ মোস্তফা কামাল লিখেছেন, 'নিজের ধারায় জগদীশচন্দ্র ছিলেন প্রথম ও শেষ বিজ্ঞানী।' এ ছাড়া সলিড-স্টেট ফিজিকস নিয়ে কাজ করেছেন তিনি, পরীক্ষণ-পদার্থবিজ্ঞান ও পরীক্ষণ-জীববিজ্ঞানে রেখেছেন অমূল্য অবদান। তাঁর রেডিও নিয়ে গবেষণার কথাও পাঠক জানেন নিশ্চয়ই। 'তর্কসাপেক্ষে' তিনিই রেডিওর আবিষ্কারক।

এই সবই ১৯ শতকের শেষের কথা। ইউরোপ-আমেরিকায় তখন বিজ্ঞানের জগতে খুলে যাচ্ছে নতুন দুয়ার। এ ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের গল্প বলতে গেলে ১৮৭৯ সালের কথা একটু আলাদা করে বলতে হবে। ৪৮ বছর বয়সী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এ সময় পাকস্থলীর ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই বিজ্ঞানীর তড়িৎ-চৌম্বক সমীকরণগুলোকে রিচার্ড ফাইনম্যান বলেছেন, ইতিহাসের অন্যতম সেরা কাজ। বিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি গড়ে দিয়েছে এসব সমীকরণ।

জগদীশচন্দ্র আসলে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে বুঝতে চেয়েছেন। জানতে চেয়েছেন প্রকৃতির নাড়ির খবর। এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন তিনি

একই বছর জার্মানিতে জন্ম নেন পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় রকস্টার—আলবার্ট আইনস্টাইন এবং সে বছরই গবেষণাগারে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি করেন হেনরিখ হার্টজ।

মঞ্চ প্রস্তুত। এবার পা রাখতে চলেছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু। মঞ্চে এসেই হইচই বাধিয়ে দেবেন তিনি। তিন বছরে ১৩টি মানসম্মত মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে সবাইকে অবাক করে দেবেন। অথচ বিজ্ঞান, গবেষণার চেয়েও তাঁকে বড় করে টানবে প্রাণ। মরমি দার্শনিক জগতে নীরবে-নিভৃতে তিনি কাটিয়ে দেবেন জীবনের শেষাংশ।

এই লেখায় জগদীশচন্দ্র নামের বিশাল মহিরুহের ব্যক্তি-মানুষের গল্পটা আমরা সংক্ষেপে জানব। তাঁর গবেষণা নিয়েই আমাদের মূল আলোচনা। তবু বিজ্ঞানী, যিনি মানুষও বটে—তাঁর মানবিক বিষয়গুলো কীভাবে চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, কীভাবে তিনি মরমি হয়ে উঠলেন, সে জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁর শৈশবে।

সে জন্য চলুন, ফিরে যাওয়া যাক ১৮৫৮ সালে।

দুই

৩০ নভেম্বর ১৮৫৮। ময়মনসিংহ। ভগবানচন্দ্র বসু ও বামাসুন্দরী দেবীর ঘরে জন্ম নিল চতুর্থ সন্তান। মা-বাবা তাঁর নাম রাখলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ভগবানচন্দ্র ময়মনসিংহের একটি ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বামাসুন্দরী গৃহিণী। তিন কন্যা ও এক ছেলে নিয়ে তাঁদের পরিবার।

জগদীশের জন্মের কয়েক বছর পরই ভগবানচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চলে এলেন ফরিদপুরে। সেখানে তিনি একটি কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে হাতের কাজ শেখানো হতো। বাড়িতে আবার অন্য আয়োজন। বিভিন্ন

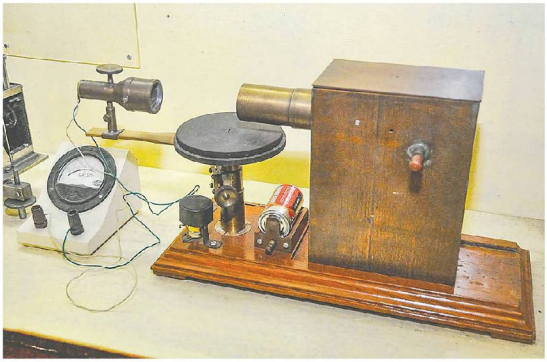

ছবি ১ : জগদীশচন্দ্র বসুর নিজ হাতে বানানো মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র।

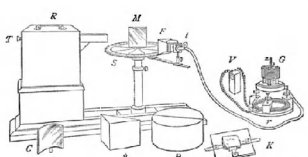

ছবি ২ : ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্রের ব্যবহৃত মাইক্রোওয়েভ যন্ত্রের ডায়াগ্রাম

পশুপাখি সংগ্রহ করে তিনি গড়ে তুলেছেন ছোট্ট চিড়িয়াখানা। প্রকৃতির সঙ্গে এভাবে পরিচয় হচ্ছে জগদীশের।

বাঙালি সমাজে তখন ইংরেজি স্কুলে পড়ার চল শুরু হয়েছে। মা-বাবার স্বপ্ন, ছেলে ইংরেজি স্কুলে পড়বে, ইংরেজি সরকারের আমলা হবে। সেখানে ভগবানচন্দ্র ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন বাংলা মাধ্যমের স্কুলে। ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে শুরু হলো তাঁর পড়াশোনা। জগদীশ লিখেছেন, 'স্কুলের দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাসির পুত্র এবং বাম দিকে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর বৃত্তান্ত শুদ্ধ হইয়া শুনিতাম।' এভাবে প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষকে চিনতে শেখেন তিনি। জাতপাত, শ্রেণি ও বর্ণপ্রথা ভেঙে খোলামনে বড় হতে থাকেন। এগুলো সবিস্তার বলার কারণ, জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও নিজস্ব ধারার বিজ্ঞানচর্চায় এসবের অবদান অনস্বীকার্য।

এবার একটু সংক্ষেপে ফাস্ট ফরোয়ার্ড করা যাক। ১৮৬৯ সালে ভগবানচন্দ্র বর্ধমানে বদলি হয়ে গেলেন। ফলাফল হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে জগদীশকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো কলকাতার হেয়ার স্কুলে। তিন মাসের বেশি তিনি সেখানে টিকতে পারলেন না। পরবর্তী গন্তব্য, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। ১৮৭৫ সালে সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন, পেলেন শিক্ষাবৃত্তি। সে সময় ফাদার লাঁফো ছিলেন ওই স্কুলের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। খ্যাতনামা এই মানুষটির অধীনেই শুরু হয় জগদীশচন্দ্রের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা।

১৮৭৭ সালে তিনি এফএ পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৮৭৯ সালে বিএ পাস করলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে। ১৮৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চলে গেলেন লন্ডনে। সেখানে বেশি দিন থাকতে পারেননি, অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখান থেকে ভগ্নিপতি আনন্দমোহন বসুর সহায়তায় চলে এলেন কেমব্রিজে। এখানে জগদীশের পড়াশোনার পরিধি অনেক বেড়ে যায়। আজকের দিনে যেমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেজর বিষয়ের পাশাপাশি এক বা একাধিক মাইনর বিষয়ে পড়াশোনা করা যায়, সেকালে বিষয়টি একটু অন্য রকম ছিল। একসঙ্গে দুটি থেকে তিনটি বিষয়ে মেজর নিয়েও অনার্স করা যেত। জগদীশচন্দ্র তা-ই করলেন। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে একসঙ্গে মেজর নিয়ে অনার্স শেষ করলেন। এ সময় তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের কাছেও পড়াশোনা করেছেন।

যাহোক, এরপর ১৮৮৫ সালের শেষ দিকে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে (বর্তমান নাম : প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা), পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে। ইউরোপীয় শিক্ষকদের তুলনায় তাঁকে অর্ধেক বেতন দিতে চেয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। এ কারণে তিন বছর তিনি কোনো বেতন নেননি। ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি চালিয়ে গেছেন গবেষণা। গুদামঘরের মতো পরিত্যক্ত একটি ঘরে দেশে পাওয়া কাঁচামাল থেকে নিজের হাতে বানিয়ে নিয়েছেন প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি। এক পয়সাও দেয়নি কলেজ তাঁকে গবেষণার জন্য। কিন্তু তিনি দমে যাননি। প্রাথমিকভাবে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল পদার্থবিজ্ঞান। পরবর্তী সময়ে এ ধারা বদলে তিনি চলে যান জীবপদার্থবিজ্ঞানে—কিংবা বলা উচিত, 'তাঁর নিজস্ব ধরনের জীবপদার্থবিজ্ঞানে'।

তিন

জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ : ১৮৯৫-১৮৯৯। এ সময় তিনি মূলত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। সেগুলোর ফলাফলও প্রকাশ করেছেন বিশ্বখ্যাত জার্নালে। দ্বিতীয় ভাগ : ১৮৯৯-১৯০২ সাল। এ সময় তিনি প্রথম জড় ও জীবের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে পদার্থবিদ্যা থেকে সরে এলেন তিনি। প্রবেশ করলেন তৃতীয় ভাগে—এ ধারাটিতে তিনি কাজ করে গেছেন জীবনভর। এটাকে বলা যায় উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজে পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ বা জীবপদার্থবিদ্যা; কিংবা আরও বেশি কিছু।

শুরুতে প্রথম ভাগের কথা বলা যাক। আগেই বলেছি, ১৮৭৯ সালে হেনরিখ হার্টজ গবেষণাগারে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি করেন। তাঁর তৈরি এ তরঙ্গকে হার্টজিয়ান তরঙ্গও বলা হয়। তাঁর নামানুসারে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সির একটির নাম দেওয়া হয়েছে হার্টজ (বাংলায় 'হার্জ'ও লেখা হয়)। কিন্তু হার্টজের তৈরি তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল অনেক বেশি, কম্পাঙ্ক ছিল কম (দুটোর সম্পর্ক বিপরীত আনুপাতিক বা ব্যস্তানুপাতিক)। ফলে এর শক্তিও ছিল খুব কম। তার ছাড়া দূরে তরঙ্গ আদান-প্রদানের জন্য এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা প্রয়োজন। হার্টজ সেটা ধীরে ধীরে করছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৫৪০ সেন্টিমিটারে নামিয়ে আনেন। এ কাজ আরও এগোনোর আগেই, ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি মাত্র ৩৬ বছর বয়সে এ বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

সে বছরের জুন মাসে লন্ডনে রয়্যাল ইনস্টিটিউটে হার্টজ স্মরণে একটি বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অলিভার লজ। এর নাম ছিল 'দ্য ওয়ার্ক অব হার্টজ অ্যান্ড সাম অব হিজ সাকসেসরস'। এই অধ্যাপক লজ তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ইতিহাসে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তিনি স্বতন্ত্রভাবে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তৈরি করেন। এ তরঙ্গ শনাক্ত করার ডিটেক্টর তৈরির অগ্রদূতদের একজন তিনি। এ-বিষয়ক একটি পেটেন্টও আছে তাঁর নামে। হার্টজিয়ান ওয়েভ বা তরঙ্গের প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন তিনি 'কোহেরার'। তাঁর গবেষণাপত্র ও হার্টজের নিজের লেখা তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গবিষয়ক বই *ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভস বিয়িং সার্চেস অন দ্য প্রোপাগেশন অব ইলেকট্রিক অ্যাকশন উইথ ফাইনাইট ভেলোসিটি থ্রু স্পেস* জগদীশকে এ তরঙ্গ নিয়ে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করে। ১৮৯৪-১৮৯৫—এই দুই বছর জগদীশ প্রেসিডেন্সি কলেজে বসে নিজ হাতে তৈরি গবেষণাগারে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ গবেষণাগারের কথা আগেই বলেছি।

সেই গবেষণাগারে বসে জগদীশচন্দ্র দ্রুতই প্রমাণ করে দেখালেন, হার্টজ আবিষ্কৃত তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সঙ্গে দৃশ্যমান আলোর কোনো পার্থক্য নেই। প্রমাণিত হলো যে আলোও তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। এ গবেষণার ফলাফল প্রবন্ধ আকারে লিখলেন 'অন পোলারাইজেশন অব ইলেকট্রিক রেজ বাই ডাবল রিফ্র্যাক্টিং ক্রিস্টালস' শিরোনামে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় ১৮৯৫ সালের ১ মে তিনি

এ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রুডলফ হর্নলে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়।

ওদিকে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ও দৃশ্যমান আলোর ধর্ম নিয়ে আরও দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে চাইছিলেন জগদীশচন্দ্র। সেগুলো ইংল্যান্ডের কোনো জার্নালে প্রকাশিত হলে ভালো হয়। সে জন্য প্রবন্ধ দুটি তিনি পাঠালেন এককালের শিক্ষক লর্ড র‍্যালের কাছে। লর্ড র‍্যালে মুগ্ধ হলেন, নিশ্চিত হলেন—এগুলো মৌলিক। এরপর সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন *ইলেকট্রিশিয়ান* জার্নালে। ১৮৯৫ সালে সেগুলো প্রকাশিত হলো।

১৮৯৫-১৮৯৬—এই দুই বছরে জগদীশচন্দ্রের মোট চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনটির কথা তো বললাম। চতুর্থটি প্রকাশিত হয় *প্রসিডিংস অব দ্য রয়্যাল সোসাইটি* জার্নালে। শিরোনাম : অন দ্য ডিটারমিনেশন অব দ্য ইনডেক্স অব রিফ্র্যাকশন অব সালফার ফর দ্য ইলেকট্রিক রেজ।

এ সময় জগদীশচন্দ্র 'খুদে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গে'র মাধ্যমে সংকেত আদান-প্রদানের চেষ্টায় অনেকখানি এগিয়ে যান। হেনরিখ হার্টজ ও গুলিয়েমো মার্কনির সমসাময়িক কালে জগদীশচন্দ্রই প্রথম মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ উৎপাদন করেন। এখানে একটু থেমে 'খুদে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ' নিয়ে দুটি কথা বলা দরকার। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে রেডিও ওয়েভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়—এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০^{৩} মিটার থেকে আরও বেশি হতে পারে। এরপর ক্রমান্বয়ে আসবে মাইক্রোওয়েভ (১০$^{-২}$ মিটার), অবলোহিত (১০$^{-৩}$ মিটার), দৃশ্যমান (.৫*১০-৬ মিটার), অতিবেগুনি (১০$^{-৮}$ মিটার), এক্স-রে (১০$^{-১০}$ মিটার) ও গামা রশ্মি (১০$^{-১২}$ মিটার)। এখানে আরও একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। বাংলায় 'রেডিও ওয়েভ'কে বলা হয় বেতার তরঙ্গ। বোঝানো হয়, এটি তার ছাড়াই চলাচল করতে পারে। আসলে রেডিও ওয়েভের নামটি এসেছে রেডিয়াল (Radial) বা রেডিয়েটিভ বিহেভিয়ার (Radiative Behaviour); এককথায় বললে, 'বিকিরণ ধর্ম' থেকে। 'তারহীন' চলাচলের বৈশিষ্ট্য থেকে এ নাম আসেনি। আসলে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সব কটিই তারহীন তরঙ্গ। সেটা গামা রশ্মি হোক বা এক্স-রে, আলো কিংবা মাইক্রোওয়েভ, যা-ই হোক না কেন। তবে আমরা এখানে বেতার তরঙ্গ বলতে 'রেডিও ওয়েভ'কেই বোঝাব।

যাহোক, জগদীশচন্দ্র কিন্তু এ সময় শুধু রেডিও ওয়েভ নিয়ে কাজ করছেন না, তিনি মাইক্রোওয়েভ নিয়েও কাজ করছেন। বলা উচিত, তাঁর মূল কাজ ছিল এই মাইক্রোওয়েভ নিয়েই। এটি উৎপাদনের পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী, তা-ও নির্ধারণ করেন তিনি।

ওপর থেকে
ধারাবাহিকভাবে
জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে
১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ
এবং ১৯৫৮ সালে
ভারত থেকে প্রকাশিত
ডাকটিকিট এবং তাঁর
লেখা প্রবন্ধ সংকলন
অব্যক্তর প্রচ্ছদ

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের কাজে জগদীশচন্দ্র এগিয়ে যান অনেক দূর। এ সময় বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে একবার কলকাতায় আসেন। নিজের শিক্ষককে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে নিজের ল্যাব ঘুরে দেখান। লর্ড র‍্যালে সব দেখে তাঁকে বললেন রয়্যাল সোসাইটিতে ফান্ড চেয়ে আবেদন করতে। জগদীশচন্দ্র আবেদন করলেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলো।

এ সময় জনসাধারণের জন্য তিনি বিজ্ঞান বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের রুম থেকে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ পাঠালেন তিনি 'কোহেরার' ব্যবহার করে। সেটা দেয়াল ভেদ করে ছুটে গেল, কাছেই অধ্যাপক পেডলারের রুমে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

এর কয়েক মাস পরে আরেকটি প্রদর্শনী আয়োজিত হলো কলকাতা টাউন হলে। সে সময়ের ব্রিটিশ ছোট লাট আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ৭৫ ফুট দূরে রাখা একটি বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেন জগদীশচন্দ্র নিজের উদ্ভাবিত মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগযন্ত্রের সাহায্যে। অর্থাৎ এভাবে তিনি ধীরে ধীরে 'কোহেরার'-এর ধারণাকে অনেকটা এগিয়ে নেন। বড় লাটের হস্তক্ষেপে কলেজ কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে এই প্রদর্শনী তিনি পরে লন্ডনেও করেছেন।

লন্ডনের কথা যখন এলই, তখন বলা প্রয়োজন—প্রেসিডেন্সি কলেজে নিজের এত দিনের গবেষণার সারসংক্ষেপ নিয়ে ১৮৯৫ সালে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন জগদীশচন্দ্র; *অ্যান অ্যাকাউন্ট অব এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চেস ক্যারিড আউট অ্যাট দ্য ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি অব দ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ইন দ্য ইয়ার ১৮৯৫*। তিনি সেটা কেমব্রিজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠান। ইউরোপে লর্ড কেলভিনসহ অনেকেই এ পুস্তিকা দেখে খুব অবাক হন। এর কিছুদিন পর জগদীশচন্দ্র চিঠি লেখেন লর্ড র‍্যালের কাছে। জানান, তিনি ইউরোপে আসতে চান। বিশ্বমঞ্চে নিজের গবেষণার কথা বলতে চান, জানতে চান ইউরোপ-আমেরিকার গবেষকদের কাজের কথা। কিন্তু তাঁর যে সেই সামর্থ্য নেই। লর্ড র‍্যালে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সেকালের ভারত-সচিব জর্জ হ্যামিলটনকে চিঠি দিয়ে বলেন ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগদানে তাঁকে সহায়তা করতে। এ ক্ষেত্রে স্যার ম্যাকেঞ্জিসহ আরও অনেকে তাঁকে সহায়তা করেছেন। যাহোক, এসব সহায়তায় সরকারি খরচে তাঁর ইউরোপে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। স্ত্রী অবলা বসুকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই তিনি এসএস ক্যালোডোনিয়া জাহাজে চেপে ইউরোপে যাত্রা করলেন।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে বক্তব্য দিলেন জগদীশচন্দ্র। 'কমপ্লিট অ্যাপারেটাস ফর স্টাডিয়িং দ্য প্রপার্টিজ অব

ইলেকট্রিক ওয়েভস' শিরোনামের এ বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন জে জে থমসন, লর্ড কেলভিন, অলিভার লজসহ অনেকে। এ বক্তৃতায় তিনি নিজের তৈরি মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগের যন্ত্রপাতিগুলো উপস্থিত সবাইকে দেখিয়েছিলেন। এত দিনের সব যন্ত্রপাতির তুলনায় তাঁর এগুলো ছিল অনেক ছোট—দৈর্ঘ্যে ১৫ সেমি, প্রস্থে ১২ সেমি ও উচ্চতায় মাত্র ৭ সেমি। সেকালের প্রচলিত কোহেরারের (আবারও মনে করিয়ে দিই, তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ আদান-প্রদানে ব্যবহৃত প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র) চেয়ে তাঁর নিজের বানানো কোহেরার ছিল অনেক উন্নত। সাধারণত এতে ধাতুচূর্ণ ব্যবহার করা হতো। তিনি এ ক্ষেত্রে লোহার স্প্রিং ব্যবহার করেছিলেন। সে সময়ের সবচেয়ে ছোট মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ—মাত্র ৫ মিমি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের খুদে তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরই তিনি থেমে গেলেন।

জগদীশচন্দ্র যে সেকালে এ কাজে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনিই যে প্রথম তারহীন বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই এ নিয়েও। কিন্তু তিনি এসবের পেটেন্ট করেননি। জগদীশচন্দ্র মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক কাজ সবার জন্য। এর স্বত্ব নিয়ে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়ার কোনো মানে নেই। আরেকটি বিষয় হলো, জগদীশচন্দ্র কাজ করেছিলেন মাইক্রোওয়েভ নিয়ে, আর গুয়েলমো মার্কনি একই কাজ করেন বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভ নিয়ে। দূরত্বও এখানে একটি বিষয় ছিল। জগদীশ যেখানে স্বল্প দূরত্বে তারহীন বার্তা পাঠিয়ে থেমে গেলেন, মার্কনি সেই কাজ করার জন্য বেছে নিলেন অতলান্তিক সমুদ্র। ১৯০১ সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি অতলান্তিকের এপার থেকে ওপারে বেতার বার্তা পাঠান এবং এটি পেটেন্টও করে নেন।

বলা হয়, জগদীশ নিজের কাজ আরও খানিকটা এগিয়ে নিলে, 'কোহেরার'কে আরও উন্নত করলে ১৯০১ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারটি একজন বাঙালি হয়তো পেতেও পারতেন। কিন্তু সেটি হয়নি। অবশ্য মার্কনির স্বীকৃতি নিয়ে জগদীশচন্দ্রের কোনো মাথাব্যথাও ছিল না। তিনি তখন ধীরে ধীরে জড় ও জীবের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এবার তাঁর ভিন্ন পথে চলার পালা।

জগদীশচন্দ্র মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক কাজ সবার জন্য। এটির স্বত্ব নিয়ে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়ার কোনো মানে নেই

চার

১০ মে, ১৯০১। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কেন্দ্রীয় মিলনায়তন।

বহু লোকের ভিড়ে জগদীশচন্দ্র অদ্ভুত এক পরীক্ষার প্রদর্শনী করছেন। একটি গাছের মূল একটি বোতলের পানির মধ্যে রাখা। গাছ থেকে তার টেনে অদ্ভুত দেখতে একটা যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো।

উপস্থিত সবাইকে জগদীশ জানালেন, বোতলের ভেতরের তরল পদার্থটি ব্রোমাইড সলিউশন। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, গাছটি শিগগিরই মারা যাবে। হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের এই লবণের দ্রবণ সহ্য করার ক্ষমতা গাছের নেই।

বিজ্ঞানী গাছের মূল সলিউশনে রেখেই চালু করে দিলেন যন্ত্র। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি কাগজের ওপর মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ওঠানামার মতো গ্রাফ আঁকতে শুরু করল। পেন্ডুলামের মতো একই নিয়মে ওঠানামা। একটু পর যন্ত্রের গ্রাফে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিল। দ্রুত ওঠানামা করছে গ্রাফ। মনে হচ্ছে, কার সঙ্গে যেন লড়ছে গাছটি। কিছুক্ষণ পর সব ওঠানামা থেমে গেল। গাছটা মরে গেছে।

উপস্থিত সবাইকে জগদীশ বললেন, গাছও প্রাণীদের মতো উদ্দীপনায় প্রতিক্রিয়া দেখায়। জোর করে মেরে ফেলা হলে গাছও আর্তচিৎকার করে। অর্থাৎ গাছেরও অনুভূতি আছে। তিনি কোথাও বলেননি, গাছেরও প্রাণ আছে। বলেছেন, গাছরা জীবের মতোই প্রতিক্রিয়া দেখায়, সাড়া দেয়। এটাই জনপ্রিয় ধারায় বদলে গিয়ে হয়ে গেছে 'গাছেরও প্রাণ আছে'।

জগদীশ দেখলেন, গাছের যে শুধু অনুভূতি আছে, তা-ই নয়। এটি জীবের মতোই জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, ব্যথায়

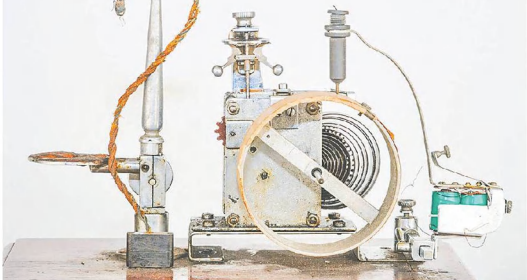

ছবি ৩ : ফটোসিন্থেটিক বাবলার। গাছের অনুভূতি সনাক্ত এ যন্ত্রই ব্যবহার করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু।

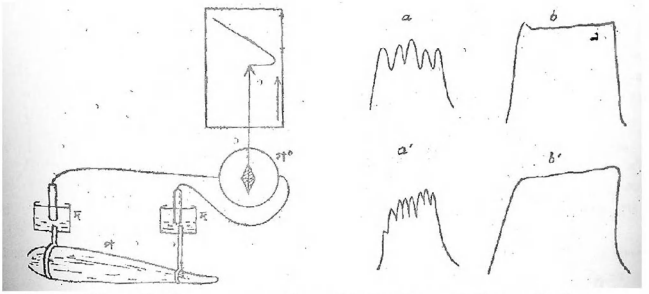

ছবি ৪ ও ৫ : বিভিন্ন বস্তুর বৈদ্যুতিক সাড়া মাপার জন্য জগদীশচন্দ্রের তৈরি চৌম্বক-লিভার রেকর্ডার (বাঁয়ে) এবং টিনের টুকরা ও মানবপেশির ওপর চালানো পরীক্ষায় এ যন্ত্রে পাওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া : ওপরে a ও b টিনের তারের রেখাচিত্র এবং a' ও b' হলো মানুষের পেশির সাড়ার রেখাচিত্র (ডানে)

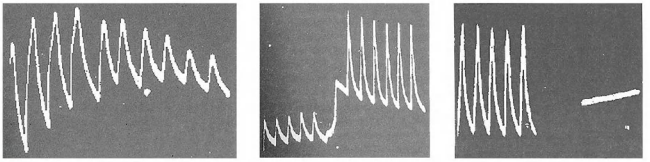

ছবি ৬, ৭ ও ৮ : টিনের টুকরায় ক্রমাগত আঘাত করলে এর সাড়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসে (বাঁয়ে)। ক্লান্তির ওষুধ হিসেবে টিনের ওপর উত্তেজক সোডিয়াম কার্বোনেট প্রয়োগ করলে দেখা যায়, সাড়া দেওয়ার পরিমাণ আবার বেড়ে গেছে (মাঝে)। টিনের ওপর অক্সালিক অ্যাসিড (বিষ) ঢেলে জগদীশচন্দ্র দেখিয়েছেন, কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না (ডানে)।

প্রতিক্রিয়া জানায় এবং বয়স হলে ধীরে ধীরে মারা যায়। রোগে ভুগলে মারা যায় স্বাভাবিক সময়ের আগেই। *অব্যক্ত* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই।'

শুধু তা-ই নয়, তিনি দেখিয়েছেন, জড় পদার্থও সাড়া দেয়। টিনের টুকরায় আঘাত করলে সেটি যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা-ও যে প্রাণীদের মতো—এটি তিনি সত্যি সত্যি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। এ নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি রয়্যাল সোসাইটিতে, 'দ্য রেসপন্স অব ইনঅর্গানিক ম্যাটার টু মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস'। পাঠক হয়তো এ পর্যায়ে বিষয়টিকে পাগলামো ভাবতে শুরু করেছেন। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, টিনের টুকরায় ক্রমাগত আঘাত করলে এর সাড়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসে। ওটা যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবদেহে যেমন ক্লান্তির ওষুধ দিলে তা সেরে ওঠে, তেমনি টিনের ওপর উত্তেজক সোডিয়াম কার্বনেট প্রয়োগ করলে দেখা যায়, ওটার সাড়া দেওয়ার পরিমাণ আবার বেড়ে গেছে! শুধু তা-ই নয়, জীবদেহ যেমন বিষ প্রয়োগে নিঃসাড় হয়ে পড়ে, টিনের ওপর অক্সালিক অ্যাসিড (বিষ) ঢেলে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বিষয়টা আসলে কী, তা আমরা ঠিক জানি না। জগদীশচন্দ্রের পর এসব গবেষণা সে অর্থে এগোয়নি। তবে জগদীশচন্দ্র এভাবে ধীরে ধীরে শুধু প্রাণী নয়, উদ্ভিদ, এমনকি জড়ের প্রতিও সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন। মায়া বোধ করতে থাকেন সবকিছুর প্রতি। এভাবে তিনি মরমি একধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেই যে শৈশবের শিক্ষা—এসব তাঁকে ধীরে ধীরে এই মায়ায় জড়িয়ে ফেলে। মূক, ভাষাহীনের প্রতি ভালোবাসায় ডুবে যান জগদীশচন্দ্র।

কিন্তু তাঁর এসব গবেষণা নিয়ে যেসব গবেষণাপত্র জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন জার্নালে পাঠিয়েছেন, সেগুলো প্রত্যাখ্যাত হয়। ভৌত বাস্তবতায় তাঁর এসব গবেষণা অনেক বিজ্ঞানী মেনে নিতে পারেননি। জগদীশচন্দ্রও এসব জার্নালের মুখাপেক্ষী থাকতে চাননি। ১৯০২ সালে তিনি একটি বইতে প্রথম এসব গবেষণার কথা প্রকাশ করেন লিখিতভাবে—*রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং*। ১৯০৬ সালে লংম্যান গ্রিন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় বই *প্ল্যান্ট রেসপন্স : অ্যাজ অ্যা মিনস অব ফিজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস*। পরের বছর প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় বই *কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি : আ সাইকো ফিজিওলজিক্যাল স্টাডি*। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর *লাইফ মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস* নামের টাউস বইটি প্রকাশ করেন চার খণ্ডে। এসব বইয়ে নিজের কাজের কথা কিছু কিছু লিখে গেছেন এই বাঙালি বিজ্ঞানী। লিখে গেছেন মূক, ভাষাহীনের প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা।

পাঁচ

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ছাড়া আরও অনেক গবেষণা করেছেন জগদীশচন্দ্র। তিনি প্রস্তাব করেন, অনেক উজ্জ্বল কোনো বস্তু থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করলে কিছুক্ষণ ধরে উজ্জ্বল বস্তুটি যে একবার দেখা যায়, আবার অদৃশ্য হয়ে যায়

ছবি ৯ : জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসু

বলে মনে হয়—এর কারণ চোখের রেটিনার পরিবাহিতা ধর্মের স্পন্দন। আগে কেউ এভাবে চিন্তা করেননি।

পদার্থবিজ্ঞানের জগতে জগদীশচন্দ্রের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সিসার একধরনের যৌগ আছে—গ্যালেনা। এটি একধরনের অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর। জগদীশ আবিষ্কার করেছিলেন, এই গ্যালেনা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবাহীর বৈশিষ্ট্য দেখায়। তখন পর্যন্ত জানা ছিল যে কেবল ধাতুই পরিবাহীর বৈশিষ্ট্য দেখায়, অন্য কিছুতে তা দেখা যায় না। অর্থাৎ অর্ধপরিবাহী বিজ্ঞানের সূচনা হয় তাঁর হাতে। এই গ্যালেনা দিয়ে তিনি গ্যালেনা ডিটেক্টরও বানিয়েছিলেন। এটি একধরনের ডায়োড ডিটেক্টর—অথচ সেকালে এই 'ডায়োড' শব্দটিও চালু হয়নি।

এই গ্যালেনা ডিটেক্টরের পেটেন্ট করার জন্য জগদীশকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করান স্বামী বিবেকানন্দের এক শিষ্যা—ভগিনী নিবেদিতা (আসল নাম: মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল)। জগদীশের হয়ে ইউএস পেটেন্ট অফিসে আবেদন করেন মার্কিন নাগরিক সারা বুল। আইনি কারণে এ পেটেন্টের অর্ধেক অধিকার দেওয়া হয় সারাকে। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের পেটেন্ট অফিসে দুটি পেটেন্ট চেয়ে আবেদন করা হয়। এ দুটি অবশ্য জগদীশচন্দ্রের নামেই দেওয়া হয়। তিনি এসব নিয়ে মাতামাতি করেননি, কাউকে জানানওনি সে সময়। এই সম্প্রতি, ২০০৮ সালে প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচন্দা ব্যানার্জি *ইন্ডিয়ান জার্নাল অব হিস্ট্রি অব সায়েন্স* জার্নালে এই পেটেন্ট দুটির কথা জানান। জগদীশচন্দ্র পরে এগুলো আর নবায়নও করাননি।

এভাবে জগদীশচন্দ্রের মাইক্রোওয়েভ গবেষণা যেমন আজকের সলিড-স্টেট ফিজিকসের সূচনা করেছে, তেমনি তাঁর গ্যালেনা নিয়ে কাজ ছিল সেমিকন্ডাক্টর ফিজিকস বা অর্ধপরিবাহী বিজ্ঞানের প্রথম কাজ। পাশাপাশি জীবপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণার কথা তো ইতিমধ্যেই বলেছি। অথচ জগদীশ শেষ বয়সে এসবের কিছু নিয়ে মাথা ঘামাননি। মূক, ভাষাহীনের প্রতি ভালোবাসাই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রধান ভাবনা।

ছয়

একজীবনে অনেক স্বীকৃতি পেয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে তাঁকে 'সিএসআই (Companionship of the star of India)' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেয়। ১৯২০ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন তিনি। তবে এসব ছাড়িয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কথাই বড় করে বলা প্রয়োজন।

১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসুর ৫৯তম জন্মদিনে উদ্বোধন করা হয় এই বিজ্ঞান মন্দিরের। এটি একটি বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র। উদ্বোধনী বক্তৃতার শুরুতে জগদীশচন্দ্র বলেন, 'আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণাগারের জন্য সর্বস্ব দান করছি।'

জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু ছিলেন নিঃসন্তান। আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের সব তাঁরা দান করেছিলেন বাংলায় বিজ্ঞান প্রসারের জন্য। সেকালের হিসাবে ১৩ লাখ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষজীবন কেটেছিল প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে। যে কথা বলতে পারে না, তার দুঃখ বুঝতে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে এর ঠাঁই হয়নি। তবু তিনি—সব খ্যাতি, বহু সম্ভাবনা, অর্থযোগ পায়ে দলে প্রকৃতির রহস্য, সবুজের মনের কথা, জড়ের দুঃখ অনুসন্ধান করে গেছেন। ঠিক যেন জীবনানন্দের কবিতার চরিত্র—'অনেক গভীর রাতে তারায় তারায় মুখ ঢাকে/ তবুও সে! কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়/ তাহার মানুষ-চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয়!'

লেখক : সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র : ১. *সবার জন্য জগদীশ বসু*/প্রদীপ দেব

২. বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান/আহমাদ মোস্তফা কামাল/ বিজ্ঞানচিন্তা নভেম্বর ২০২০

৩. উইকিপিডিয়া এবং ৪. বোস ইনস্টিটিউট

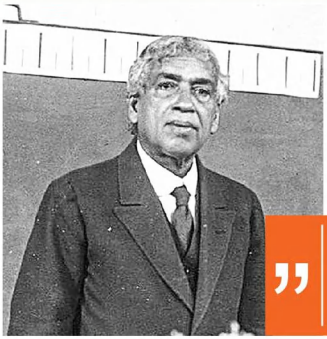

ইতিহাসে প্রথম মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ তৈরি করেন তিনি। একাধারে ছিলেন সলিড-স্টেট ফিজিকস গবেষণার অগ্রপথিক ও জীবপদার্থবিদ। জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনের নানা দিক, একনজরে...

> ” সন্তানের জন্য জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র।

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ । ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

স্নাতক ডিগ্রি লাভ

১৮৭৯ সালে জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক শেষ করেন। সরকারি চাকরির ইচ্ছা থাকলেও পরে বাবার ইচ্ছায় বিজ্ঞান পড়তে লন্ডনে যান।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বসু বিজ্ঞান মন্দির। উদ্বোধনের দিন তিনি নিজের ও স্ত্রীর প্রায় সব অর্থ, সে কালের হিসেবে প্রায় ১৩ লাখ টাকা এ গবেষণাগারে দান করার ঘোষণা দেন।

বেতন নিতে অস্বীকৃতি

বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে পরপর তিন বছর চাকরি থেকে কোনো বেতন নেননি তিনি।

সম্মাননা

ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯১৭ সালে নাইটহুড উপাধি দেয়। ১৯২০ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি থেকে ফেলোশিপ পান তিনি। এ ছাড়া জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে ভূষিত হয়েছেন নানা সম্মাননায়।

পেটেন্টে অনীহা

জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞানের জ্ঞান সবার জন্য। নিজের কোনো আবিষ্কার তিনি পেটেন্ট করাতে চাননি। এ কারণেই মাইক্রোওয়েভ সর্বপ্রথম তৈরি করেও কোনো পেটেন্ট করাননি তিনি। তবে সহকারীর প্রচেষ্টায় ১৯০৪ সালে গ্যালেনা ডিটেক্টর যন্ত্রের পেটেন্ট করান, পরে অবশ্য আর নবায়ন করেননি।

প্রকৃতির অব্যক্ত ভাষা ও কল্পবিজ্ঞান

১৯২১ সালে *অব্যক্ত* নামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয় প্রকৃতির অজানা দিক নিয়ে। এ ছাড়াও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান কল্পকাহিনি রচনার অগ্রপথিক তিনি। সেই উনিশ শতকে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা বিজ্ঞান কল্পকাহিনি *পলাতক তুফান*।

অলংকরণ : মাসুক হোসেন

মেঘনাদ সাহা

নক্ষত্রের জীবন যাঁর

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

সূর্যের আলোর বর্ণালিতে কোথায় পাওয়া যাবে কোন মৌল বা আয়নের ছাপ? সেটা ব্যাখ্যার ভিত্তি গড়ে দেন তিনি। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান কিংবদন্তিতুল্য। তিনি মেঘনাদ সাহা, দুর্লভ এক বাঙালি নক্ষত্র...

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

সময়টা ১৯১৬ সাল। সে বছরই কলকাতার রাজাবাজারে বিজ্ঞান কলেজের বাড়িটি তৈরি হলো। পদার্থবিদ্যা বিভাগে ক্লাস শুরু হলো জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকে। তখনো সি ভি রামন যোগ দেননি, অথচ পালিত অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা। তাঁদের মাসিক বেতন ২০০ টাকা। তাঁরা দুজনই গণিতের ছাত্র। কিন্তু এখানে পড়াতে হবে পদার্থবিদ্যা। অতএব প্রয়োজন আত্মপ্রস্তুতি। স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান দুই বন্ধু। কিন্তু উপযুক্ত বইপত্র নেই কোথাও। এ ছাড়া তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, পড়ানো ও গবেষণা পরস্পরের সম্পূরক এবং দুটোই একসঙ্গে চলা উচিত।

এদিকে ইউরোপে বিজ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে তখন একের পর এক নবদিগন্তের উন্মোচন হচ্ছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, বোরের পরমাণু মডেল, আরও কত-কী! অথচ সেসব খবর সাগর পেরিয়ে সময়মতো এখানে এসে পৌঁছায় না। এক *ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন* ছাড়া বিজ্ঞানের আর কোনো পত্রিকাই প্রেসিডেন্সি কলেজে আসে না। এ ছাড়া বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত কঠকর।

অবশেষে ড. ব্রুল নামে এক অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল শিবপুর বি ই কলেজে, যাঁর দৌলতে সম্প্রতি প্রকাশিত একগুচ্ছ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধের সন্ধান পেলেন তাঁরা। অনেক প্রবন্ধই জার্মান ভাষায় প্রকাশিত। মেঘনাদ জার্মান জানেন, সত্যেনও দ্রুত শিখে নিচ্ছেন এই ভাষা। দুজনে মিলে পড়ে ফেললেন প্ল্যাঙ্কের তাপীয় বিকিরণ-সম্পর্কিত বইপত্র, নীলস বোরের পরমাণু তত্ত্ব, আইনস্টাইনের গবেষণা প্রবন্ধ, নার্নস্টের তাপবিজ্ঞান-সম্পর্কিত লেখালেখি ইত্যাদি। মেঘনাদ কলেজে তাপবিজ্ঞান, তাপগতিতত্ত্ব ও বর্ণালিতত্ত্ব পড়াবার ভার নিলেন।

দুই বন্ধু পদার্থবিদ্যা বিভাগে পড়ানো শুরু করার এক বছর পর পালিত অধ্যাপক হিসেবে কলেজে যোগ দিলেন সি ভি রামন। কাগজে-কলমে তাঁরা রামনের সহকারী হলেও ক্লাস নেওয়া বা গবেষণার কাজকর্ম করেন নিজেদের মতোই স্বাধীনভাবে। বিকিরণ, স্থিতিস্থাপকতা, ইলেকট্রনের তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা করেন মেঘনাদ। তত দিনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে মিলে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব-সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেন তিনি। এর মধ্যে আছে আইনস্টাইনের লেখা দুটি গবেষণা প্রবন্ধ (১৯০৫ সালে প্রকাশিত বিশেষ আপেক্ষিকতা এবং ১৯১৫-এ

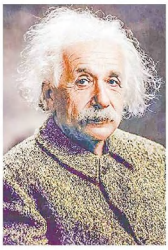

ওপর থেকে
ধারাবাহিকভাবে
আলবার্ট আইনস্টাইন,
নীলস বোর ও
সিসিলিয়া পাইন

প্রকাশিত সাধারণ আপেক্ষিকতা)। এ ছাড়া ১৯০৯ সালে প্রকাশিত মিনকাওস্কির লেখা প্রবন্ধটিও পরিশিষ্টসমেত অনুবাদ করে ফেলেন তাঁরা। ১৯২০ সালে *দ্য প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি* নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে এই লেখাগুলো নিয়ে একটি সংকলন বের হয়। বইটির একটি চমৎকার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। আজও এ বই বাজারে পাওয়া যায়।

এদিকে ১৯১৭ সাল থেকেই মেঘনাদ কয়েকটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যেখানে তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব, আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর স্পর্শ করতে চেষ্টা করেন তিনি। ১৯১৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে মিলে বাস্তব গ্যাসের অবস্থা-সম্পর্কিত একটি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেঘনাদ। বিকিরণ ও তার চাপসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা থিসিসটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি ডিগ্রি পেয়েছিলেন তিনি। কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট।

একদিন তাপগতিতত্ত্বের ক্লাসে রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়াচ্ছিলেন মেঘনাদ। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল এক ভাবনা—নক্ষত্রের অভ্যন্তরে উচ্চ তাপমাত্রায় পরমাণুর বাইরের দিকে আলগা হয়ে থাকা ইলেকট্রনগুলো বেরিয়ে গিয়ে আয়ন তৈরি হতে পারে। অবশ্য কতগুলো ইলেকট্রন বের হবে, সেটা নির্ভর করবে ইলেকট্রনগুলো কত দৃঢ়ভাবে পরমাণুতে বাঁধা পড়ে আছে, তার ওপর। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাঁচেই তিনি বের করে ফেললেন, ঠিক কতগুলো পরমাণু এভাবে ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়নে পরিণত হয়। আর তা-ই যদি হয়, তবে সূর্যের আলোর বর্ণালিতে কোনো মৌল বা আয়নের ছাপ ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে আর কোথায় যাবে না, সেটা তাঁর সমীকরণ থেকে বলে দেওয়া যাবে।

বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলা যাক। ১৮১৪ সাল নাগাদ জার্মান বিজ্ঞানী জোসেফ ভন ফ্রনহফার লক্ষ করেন, সূর্যের বর্ণালিতে কিছু কৃষ্ণবর্ণের রেখা রয়েছে। এমনকি নক্ষত্রদের বর্ণালিতেও এ ধরনের কালো রেখা দেখা যায়। নিজ হাতে তৈরি বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে তিনি এই রেখাগুলোর কম্পাঙ্ক পরিমাপ করেন। বস্তু উত্তপ্ত হলেই তা থেকে আলো বিকিরিত হয়। এ ছাড়া আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায়ও জানি, কোনো পদার্থকে অগ্নিশিখার ভেতরে প্রবেশ করালে শিখার বর্ণের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন উপাদান মৌলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত।

আসলে প্রতিটি মৌলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণালি রয়েছে। উত্তাপ

বর্ণ অনুযায়ী নক্ষত্রগুলোকে O, B, A, F, G, K, M—এই ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। O শ্রেণির নক্ষত্রগুলো সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত এবং M নক্ষত্ররাজি সবচেয়ে শীতল। সূর্য একটি G শ্রেণির তারা। ছবিতে রঙের তারতম্যের মাধ্যমে তাপমাত্রার পার্থক্য বোঝানো হচ্ছে।

বাড়ালে বর্ণালিচিত্রে নতুন নতুন রেখা সংযোজিত হয় এবং জটিলতা বাড়তে থাকে। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বর্ণালিরেখার জটিলতা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে। এ রকম হাজারো ফ্রনহফার রেখা নিয়ে গবেষণা করে ১৮৫৯ সাল নাগাদ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বিজ্ঞানী গুস্তাভ কার্শফ। তাঁর বক্তব্য ছিল, কোনো বস্তু একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের উজ্জ্বল রেখা উৎপন্ন করতে পারলে অবস্থাবিশেষে সেই একই কম্পাঙ্কের কৃষ্ণরেখাও উৎপন্ন করতে পারবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পদার্থটি যে বর্ণের আলো বিকিরণ করে, ঠিক সেই বর্ণের আলো শোষণও করতে পারে। আর এই বিকিরণ ও শোষণের অনুপাত নির্ভর করে কেবল তাপমাত্রার ওপর, উপাদানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিবৃতিকে আমরা কার্শফের সূত্র বলে জানি। তাঁর মতে, সূর্যের অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি। আর সেখান থেকে নিঃসৃত সাদা আলো সূর্যের বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রার আবরণ অতিক্রম করার সময় এই অঞ্চলের উপাদান মৌলগুলো নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাদা আলো থেকে বর্ণ শোষণ করে নেয়। সে জন্যই বর্ণালিচিত্রে আমরা কালো রেখা দেখতে পাই।

নক্ষত্রের বর্ণালিতে পাওয়া রেখার সঙ্গে পৃথিবীতে প্রাপ্ত মৌলদের বর্ণালিরেখা মিলিয়ে নক্ষত্রলোকের উপাদান সম্পর্কে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা। রাতের আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়, একেকটা নক্ষত্রের আলো একেক রকম। বর্ণ অনুযায়ী নক্ষত্রগুলোকে O, B, A, F, G, K, M—এই ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় [এটি মনে রাখার সহজ উপায় Oh Be A Fine Girl, Kiss Me.]। এখানে O শ্রেণির নক্ষত্রগুলো সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত (এরা সংখ্যায় খুব কম, প্রতি ৩০ লাখ নক্ষত্রের মধ্যে ১টি) এবং M নক্ষত্ররাজি সবচেয়ে শীতল।

আমাদের সূর্য একটি G শ্রেণিভুক্ত নক্ষত্র। সৌরমণ্ডল ও তার বাইরের মহাজাগতিক উপাদান সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা তখনো বিজ্ঞানীদের ছিল না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, গ্রহ, উপগ্রহসহ আমাদের সৌরমণ্ডলের সবকিছুই সূর্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তাই এদের গঠনগত উপাদান অভিন্ন। এমনকি তাঁরা মনে করতেন, তাপমাত্রার পার্থক্য হলেও সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিবীর মতো হুবহু একই উপাদানে তৈরি। হেনরি রল্যান্ড নামের এক মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদের এই আস্ত পৃথিবীটাকে যদি কোনোভাবে সূর্যের সমান উষ্ণতায় নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সেটা থেকে নির্গত আলোকরশ্মি ঠিক সূর্যের মতোই হবে।'

এ ছাড়া নক্ষত্রের গঠন-সম্পর্কিত এডিংটনের তত্ত্বও রল্যান্ডের বক্তব্যকে সমর্থন জোগায়। কারণ, এডিংটনের সমীকরণ অনুযায়ী সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্রের মূল উপাদান সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন, আয়রন ইত্যাদি মৌল, যেগুলো আমাদের পৃথিবীর চেনা পরিবেশে যথেষ্ট মাত্রায় উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আরেকটি। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ৯২টি মৌলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সবার বর্ণালিরেখা সূর্যে পাওয়া যায়নি। যেমন রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম মৌল দুটি আমাদের পৃথিবীতে বেশ সহজলভ্য। এদের শিখাও খুব উজ্জ্বল। অথচ সৌরবর্ণালিতে এরা অনুপস্থিত। এ ছাড়া সেই বর্ণালিতে প্রাপ্ত তথ্য কিছুতেই আমাদের পৃথিবীর হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলছে না।

ফিরে আসা যাক মেঘনাদ সাহার কথায়। কলকাতায় বসেই পরপর চারটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছিলেন মেঘনাদ। সেটা ১৯১৯ সালের শেষ দিক। প্রবন্ধগুলো প্রকাশের পরই আমেরিকা ও ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল। সৌরবর্ণালি বিশ্লেষিত তথ্যে সাহার সমীকরণের সাফল্যে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি নরিস। তত দিনে বোরের পরমাণু তত্ত্বের ধারণা বিজ্ঞানীরা জেনে গিয়েছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত শক্তির আলোককণা (ফোটন) হজম করে ফেলতে পারলে পরমাণুর কক্ষস্থিত ইলেকট্রন লাফিয়ে উচ্চ শক্তিস্তরে চলে যায় এবং শক্তি ত্যাগ করলে উচ্চ কক্ষ থেকে নিম্ন কক্ষে নেমে আসে। কিন্তু এই গৃহীত শক্তির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে পরমাণুটি উত্তেজিত হয়ে নিজের বাইরের কক্ষের এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে বর্জন করে আয়নে পরিণত হতে পারে।

মেঘনাদ বুঝতে পারলেন, নাক্ষত্রিক পরিবেশে এই আয়নে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মতো উভমুখী প্রক্রিয়া। সেখানে ধাক্কাধাক্কির ফলে পরমাণুগুলো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আয়নে পরিণত হয়। আবার ইলেকট্রন জোগাড় করে নিজেদের অটুট পারমাণবিক অবস্থায় ফিরেও আসে। দ্বিমুখী ভারসাম্যের এই অবস্থা নির্ভর করবে পরিবেশের চাপ ও তাপমাত্রা উভয়ের ওপর। তাপমাত্রা বাড়ালে আয়ন উৎপন্ন হওয়ার পাশাপাশি পরমাণু ও আয়নের গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই বর্ণালি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে।

মেঘনাদ আগ্রহী ছিলেন সূর্যের বর্ণালি নিয়ে। তাই প্রথমেই সূর্যের গঠন সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া দরকার। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, তাতে ধারণা করা হয়, সূর্যে একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাইরে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে কয়েকটি অঞ্চল। সবচেয়ে বাইরের আস্তরণটি হলো বর্ণমণ্ডল (ক্রোমোস্ফিয়ার), এর ঠিক নিচে রয়েছে আলোকমণ্ডল (ফোটোস্ফিয়ার)।

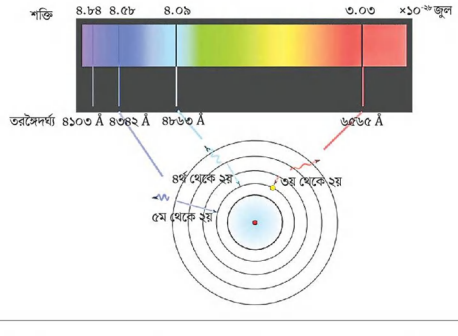

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাইড্রোজেনের চতুর্থ কক্ষপথ থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথে আসার সময় ইলেকট্রন যে শক্তি ছেড়ে দেয়, তা ৪ হাজার ৩৪২ অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (বা গাঢ় নীল আলো) হিসেবে দেখা যায়। একইভাবে পঞ্চম কক্ষপথ থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথে আসা আলো সবুজ, আর তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় কক্ষপথে আসা আলো লালচে দেখায়।

কলকাতায় বসেই পরপর চারটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছিলেন মেঘনাদ। সেটা ১৯১৯ সালের শেষ দিক। প্রবন্ধগুলো প্রকাশের পরই আমেরিকা ও ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল

এই দীপ্ত অংশটুকুই আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। বর্ণমণ্ডলের উপরিতল থেকে সদা উৎক্ষিপ্ত জ্বলন্ত শিখাঞ্চলকে ইংরেজিতে বলা হয় প্রমিনেন্স। এর বাইরে থাকা হালকা আগুনের অংশটিকে বলে করোনা।

বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রা মোটামুটি ৬ হাজার কেলভিন। সেখান থেকে সূর্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকলে ক্রমে তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। কেন্দ্রে এসে পৌঁছালে তা হবে প্রায় দুই কোটি কেলভিন। বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রাতেই যেকোনো পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। সূর্যের অভ্যন্তর থেকে আসা শক্তির প্রভাবে উত্তেজিত পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রন স্থানান্তর এবং আয়নে পরিণত হওয়ার মতো ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলে। সৌরবর্ণালিতে প্রাপ্ত ক্যালসিয়ামের রেখাগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন মেঘনাদ। সৌরচাকতি থেকে ১৪ হাজার কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত প্রাপ্ত অঞ্চলের বর্ণালিতে ক্যালসিয়ামের আয়নিত অবস্থায় থাকার চিহ্ন স্পষ্ট। কিন্তু পাঁচ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় উষ্ণতা বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রয়েছে কেবল অ-আয়নিত ক্যালসিয়াম পরমাণু। অথচ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের বেলায় ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ সৌরপরিবেশে সব পরমাণু সমানভাবে আয়নিত হয় না। তাপমাত্রার পাশাপাশি বিকিরণ চাপের এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

মেঘনাদ ধরে নিলেন, বর্ণমণ্ডলের গঠন অনেকটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো। তবে এখানে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা যে হারে হ্রাস পায়, আঞ্চলিক চাপ তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে কমতে থাকে। এবার বর্ণমণ্ডলের বিভিন্ন তাপমাত্রায় মৌলদের আয়নিত পরমাণুর সংখ্যা হিসাব করলেন তিনি। দেখলেন, চাপ হ্রাসের জন্যই কম তাপমাত্রাতেও ক্যালসিয়াম আয়নিত হতে পারে। আর এভাবেই নক্ষত্রদের শ্রেণি ও ঔজ্জ্বল্য-সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন মেঘনাদ। বছর কয়েকের ব্যবধানে তাঁর গবেষণার সূত্র ধরেই নক্ষত্রের গঠনগত উপাদান-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন ২৫ বছরের তরুণী পদার্থবিদ সিসিলিয়া পাইন।

সাহার সমীকরণ প্রয়োগ করে বর্ণালির তথ্য বিশ্লেষণের পর সিসিলিয়া দেখলেন, নক্ষত্রের তাপমাত্রা যা-ই হোক না কেন, প্রতিটির গঠনগত উপাদান মোটামুটি একই। নাক্ষত্রিক বর্ণালি বিশ্লেষণ করে সেখানে উপস্থিত মোটামুটি ১৫টি মৌলিক উপাদানের আপেক্ষিক প্রাচুর্য গণনা করেছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী, লিথিয়াম থেকে বেরিয়াম পর্যন্ত মৌলের পরিমাণ সব নক্ষত্রের ক্ষেত্রে একই রকম, আনুপাতিক দিক থেকে যা মোটামুটি পৃথিবীর মতোই, কিন্তু সেখানে হাইড্রোজেনের প্রাচুর্য পৃথিবীর তুলনায় ১০ লাখ গুণ বেশি, আর হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি কয়েক হাজার গুণ। অর্থাৎ সূর্যসহ মহাবিশ্বের যেকোনো নক্ষত্রের মোট ভরের সিংহভাগই হলো হাইড্রোজেন। অর্থাৎ সিসিলিয়ার হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী এডিংটনসহ সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান একেবারে ভ্রান্ত। কিন্তু একজন পিএইচডি ছাত্রীর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মহলের সামনে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। সিসিলিয়া পাইনের জোরের জায়গা বলতে শুধু সাহা সমীকরণ। সেটা তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেছেন তিনি। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য তিনি যে থিসিস লিখেছিলেন, ১৯২৫ সাল নাগাদ সেটা *স্টেলার অ্যাটমোস্ফিয়ারস* নামে হার্ভার্ড অবজারভেটরি মনোগ্রাফ হিসেবে প্রকাশিত হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর লেখা মনোগ্রাফটি ৬০০ কপির বেশি বিক্রি হয়েছিল।

সিসিলিয়ার থিসিস পরীক্ষকদের একজন ছিলেন প্রিন্সটন অবজারভেটরির পরিচালক এবং 'পৃথিবী ও সূর্য একই

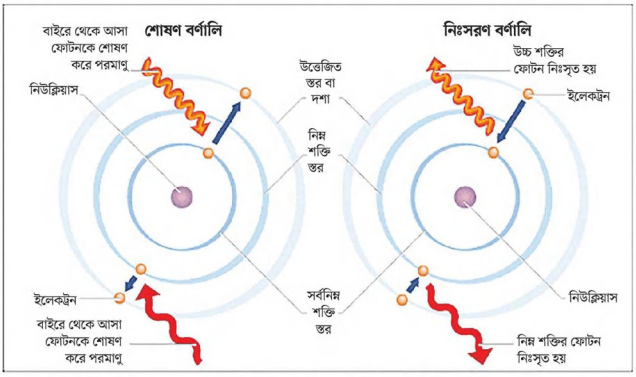

পরমাণুতে ইলেকট্রনের ফোটন কণা শোষণ ও নিঃসরণ প্রক্রিয়া। তত্ত্ব অনুযায়ী, উপযুক্ত শক্তির ফোটন হজম করে পরমাণুতে ইলেকট্রন লাফিয়ে উচ্চ শক্তি স্তরে চলে যায়। আবার শক্তি নিঃসরণ করে উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে নেমে আসে।

উপাদানে তৈরি'—এ ধারণার একজন শক্তিশালী প্রবক্তা হেনরি রাসেল। নক্ষত্রলোকে হাইড্রোজেনের প্রাচুর্যের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে কিছুতেই মানতে রাজি ছিলেন না তিনি। পরে অবশ্য সিসিলিয়াকে তাঁর আবিষ্কারের যোগ্য সম্মান জানাতে কার্পণ্য করেননি রাসেল। যেহেতু হার্ভার্ডে তখনো নারীদের ডিগ্রি প্রদান করার প্রথা ছিল না, তাই র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পান সিসিলিয়া। এ ঘটনার প্রায় ৪০ বছর পর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অটো স্ট্রাভ *স্টেলার অ্যাটমোস্ফিয়ারস* থিসিসটিকে 'জ্যোতির্বিদ্যায় লেখা সবচেয়ে মেধাবী পিএইচডি থিসিস' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯২৭ সালে বিজ্ঞান গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে মেঘনাদ লাভ করলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ। রামানুজন, জগদীশচন্দ্র, সি ভি রামনদের মতো দিকপাল বিজ্ঞানীদের পর পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে এই সম্মান পান তিনি। পরাধীন ভারতের একজন বিজ্ঞানসাধকের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করা এক বিরাট ঘটনা। বড়লাট স্বয়ং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, সঙ্গে গবেষণার জন্য অনুদান হিসেবে তিন শ পাউন্ড আর্থিক সহায়তা। এমনকি বেশ কয়েকবার নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর পক্ষে মনোনয়নও জমা পড়েছিল। যদিও নোবেল পুরস্কার তিনি পাননি। অবশ্য নোবেল না পেলেও বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অবদান কিছু কম হয়ে যায় না।

তবে বিজ্ঞানী হিসেবে মেঘনাদের জীবনপথ খুব সহজ ছিল না, বিশেষত বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ববোধ সেই পথকে আরও বন্ধুর করে তুলেছিল। সি ভি রামনের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য তো প্রায় সর্বজনবিদিত, এমনকি সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তৈরি হয়েছিল মানসিক ব্যবধান। একসময় (১৯৩০-১৯৩৮) কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। এখানে ফিরে পরমাণুর কেন্দ্র-সম্পর্কিত পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন তিনি। এমনকি তাঁর উদ্যোগেই নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মেঘনাদ সাহা।

সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ নামের দেশটিকে তখন গুছিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় চলছে। মেঘনাদ অনুভব করলেন, যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটিতে চিন্তা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে, সেদিকে এবার নজর দেওয়া দরকার। সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিলেন তিনি। তবে বিজ্ঞানী হয়ে রাজনীতির অলিন্দে পা রেখেছেন, সমসাময়িক কালেই এমন উদাহরণ আরও পাওয়া যায়। বিশেষত মেঘনাদের পরিচিত দুই নোবেলজয়ী ইংরেজ বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট ও হিল ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সে জয়ী হয়েছিলেন। এ ছাড়া মার্কিন বিজ্ঞানী গ্লেন সিবর্গ (তিনিও নোবেলজয়ী) ছিলেন সিনেটের সদস্য। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষা, নদী পরিকল্পনা, শিল্পায়ন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লোকসভায় একাধিক বক্তব্য রেখেছিলেন মেঘনাদ সাহা। তবে সংসদ সদস্য হিসেবে নিজের মেয়াদকাল পূর্ণ করতে পারেননি তিনি। সেদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সাল। রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটার পরই অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মেঘনাদ। কাছেই ওয়েলিংড হসপিটালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। একরোখা অদম্য মানুষটি এবার জীবনের কাছে হার মানলেন।

জীবন থেমে গেলেও রয়ে যায় উত্তরাধিকার। আজও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় মেঘনাদের আবিষ্কৃত তাপীয় আয়নীভবন তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়। এমনকি তাঁর স্বপ্নের নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (বর্তমান নাম : সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস) বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক গবেষণাগার। বিজ্ঞানসাধকেরা তো এভাবেই বেঁচে থাকেন!

লেখক : শিক্ষক, রসায়ন বিভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুল, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সূত্র : ১) *মেঘনাদ সাহা*, গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, খোয়াবনামা, ২০১৯
২) *মেঘনাদ রচনা সংকলন*, সম্পাদনা : শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট লংম্যানস, ১৯৮৬
৩) *অবিনাশ মেঘনাদ সাহা*, অত্রি মুখোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ, ২০১২
৪) *What Stars Are Made Of*, Donovan Moor, Harvard University Press, 2020

বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁর আয়নায়ন তত্ত্বকে বলা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। চলুন, এই বিজ্ঞানীর জীবনের নানা দিক জেনে নিই একনজরে।

> সাহার আয়নায়ন তত্ত্ব আর গ্যালিলিওর দূরবিন জ্যোতির্বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ১০ আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম।
> —**আর্থার এডিংটন,** ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ

মেঘনাদ সাহা

জন্ম : ৬ অক্টোবর ১৮৯৩। মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

রয়্যাল সোসাইটির ফেলো

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন ১৯২৩ সালে। ১৯২৭ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

মুদিদোকানি থেকে লোকসভার সদস্য

গরিব মুদিদোকানির ঘরে জন্ম নেওয়া এই বিজ্ঞানী প্রথম জীবনে গরু চরিয়েছেন, ছাত্রজীবনে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে হয়েছেন সোচ্চার। পরে নিজেই জড়িয়েছেন রাজনীতিতে। ১৯৫২ সালে ভারতীয় লোকসভার নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

একাই এক শ!

কারও অধীন পিএইচডি গবেষণা করেননি মেঘনাদ সাহা। ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে প্রকাশিত তাঁর ৬টি গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে জমা দেন থিসিস। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি পান তিনি।

জন্ম ও শৈশব বাংলাদেশে

মেঘনাদ সাহার জন্ম বাংলাদেশের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার শেওড়াতলী গ্রামে। এখানেই কেটেছে তাঁর শৈশব।

নোবেল-বঞ্চিত বাঙালি

১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁকে মনোনয়ন দেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও শিশিরকুমার মিত্র। ১৯৩৭ সালে আর্থার কম্পটন, ১৯৩৯ সালে শিশিরকুমার মিত্র এবং ১৯৪০ সালে আবারও আর্থার কম্পটন মনোনয়ন দিয়েছিলেন তাঁকে।

জার্নাল প্রতিষ্ঠা

১৯৩৫ সালে মেঘনাদ সাহা একটি জার্নাল প্রতিষ্ঠা করেন। জার্নালটির নাম *সায়েন্স অ্যান্ড কালচার*।

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মহাবিশ্বের অর্ধেক কণা যাঁর নামে

দীপেন ভট্টাচার্য

বাঙাল মুলুক থেকে চিঠি এসেছে। চিঠি পেয়ে নড়েচড়ে বসলেন আইনস্টাইন। বাঙালি এক তরুণের গবেষণাপত্র ওটা। নিজেই জিনিসটা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে পাঠালেন প্রকাশের জন্য। সেই গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো। মহাবিশ্বের অর্ধেক কণার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ব্যবহৃত হবে এটি। ইতিহাসখ্যাত সেই গবেষণার বৈজ্ঞানিক সুলুকসন্ধান...

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন রেনেসাঁ মানুষ। বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতেন, কিন্তু সাহিত্য ও সংগীতেও ছিল তাঁর আগ্রহ। রাগসংগীতের ধ্বনিবিজ্ঞান আর ফরাসি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন ছাড়াও রয়েছে বর্ণালিবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যানবিদ্যা, একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব, তাত্ত্বিক বলবিদ্যা, থার্মোলুমিনাসেন্স, এমনকি আয়নমণ্ডল নিয়ে গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি জৈব রসায়নের ওপর একটি ল্যাব স্থাপন করেছিলেন, আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করেছিলেন এক্স-রে গবেষণাগার। এই উদ্যোগগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি অন্য গবেষকদের কাজে সাহায্য করেছেন। তবে নিজে যে পরীক্ষামূলক কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর সব কটা নিয়ে গবেষণাপত্র সেভাবে লিখে যাননি। কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর তাঁর কাজ চারটি প্রবন্ধে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই যুগান্তকারী কাজটির ব্যাপারে তিনি বিস্তারিতভাবে সর্বজনবোধ্য কোনো কিছু লিখে যাননি।

সত্যেন বসু তাঁর সংখ্যায়ন তত্ত্বে কীভাবে উপনীত হলেন, সেটির ঐতিহাসিক পটভূমি এবং পরবর্তী ক্রমবিকাশ নিয়ে অধ্যাপক পার্থ বসু *এস. এন. বোস কালেক্টেড সায়েন্টিফিক পেপারস* (১৯৯৪) বইতে একটি খুব গভীর আলোচনা করেছেন। এই ক্রমবিকাশে দুটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সত্যেন বসু ফোটন কণার যে কৌণিক ভরবেগ আছে, তা হয়তো অনুমান করেছিলেন। আরেকটি হলো, তিনি ভেবেছিলেন, পরমাণুর ভেতর উচ্চ শক্তির কক্ষপথের ইলেকট্রন তার কক্ষপথ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিচু শক্তির কক্ষপথে স্থানান্তরিত হয় না, এতে বাইরের আপতিত বিকিরণের একটা ভূমিকা আছে। এ নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর হয়তো একটা মতবিরোধ ছিল। আইনস্টাইনের মতে, পরমাণু থেকে আলোক নির্গমনের দুটি পদ্ধতি। একটি হলো ইলেকট্রনের স্বতঃস্ফূর্ত স্থানান্তর, অপরটি হলো আপতিত বিকিরণে উদ্দীপিত ইলেকট্রনের নিচু শক্তির কক্ষপথে স্থানান্তর। বর্তমান বিজ্ঞান বসুর অবস্থানকেই কিছুটা প্রাধান্য দেয়। কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনা হবে সত্যেন বসুর ১৯২৪-এ লেখা প্রথম প্রবন্ধটি নিয়ে, যেটির জন্য তাঁর নাম বিজ্ঞানে চিরদিনের মতো স্থান পেয়েছে।

১৯২১ সালে সত্যেন বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে যোগ দিলেন, তারপর কিছুটা মেঘনাদ সাহার উৎসাহে 'কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ' (Blackbody radiation) নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শুরুই হয়েছিল কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের একটি সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে। কৃষ্ণবস্তুটি কী? এটি হলো একটি আদর্শায়িত কালো বস্তু, যা সব আপতিত তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ শুষে নেবে, কিন্তু নিজে তার তাপমাত্রা অনুযায়ী আলো বিকিরণ

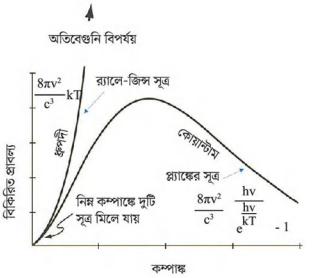

চিত্র ২ : কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ-বর্ণালি। ধ্রুপদি বিজ্ঞানের গণনা পরীক্ষাগারে লব্ধ প্রাবল্য-কম্পাঙ্কের চিত্রটির সঙ্গে মিলছিল না।

করবে—একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে নয়, বরং বিভিন্ন তরঙ্গের বর্ণালিতে। ১৮৫৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কার্শফ আমাদের আদর্শায়িত কৃষ্ণবস্তুর ধারণাটি দিয়েছিলেন। একটি চুল্লিকে কালো রং করে, তাপ কুপরিবাহী বস্তু দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে, তাতে শুধু একটা গর্ত (গর্তটির দেয়ালও কালো রঙের হবে) রাখতে হবে। ওই গর্ত থেকে বিকিরণ বের হওয়ার একটা পথ থাকতে হবে (চিত্র ১)। এর ফলে বাইরে থেকে আসা সব আলোকতরঙ্গ সেই গর্তে বা ভেতরের প্রকোষ্ঠের কালো রঙে শোষিত হয়ে যাবে, অন্যদিকে চুল্লি থেকে উদ্ভূত বিকিরণ বাইরে দেখা যাবে।

যদিও আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর একটি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি আছে, কিন্তু খুব সাধারণভাবে বললে, প্রতিটি বস্তুই কমবেশি কৃষ্ণবস্তু—সূর্য, আমাদের চারদিকের সব জিনিস, এমনকি আমাদের দেহের বিকিরণকেও কৃষ্ণবস্তুর বর্ণালি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, ধ্রুপদি বা চিরায়ত পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী, বস্তুর তাপ থাকলেই তা থেকে বিকিরণ বের হবে। আর বস্তুর তাপমাত্রা যত বেশি হবে, তত উচ্চ শক্তিতে এবং পরিমাণে সেই বস্তু আলো বিকিরণ করবে।

২ নম্বর চিত্রে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কৃষ্ণবস্তুর বর্ণালি দেখানো হচ্ছে—x-অক্ষে কম্পাঙ্ক এবং y-অক্ষে বিকিরণের পরিমাণ, ঔজ্জ্বল্য বা প্রাবল্য (Intensity)। আলোর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশি হবে, তার শক্তিও তত বেশি হবে। আর মোট প্রাবল্যের সর্বোচ্চ মানটি ডান দিকে, অর্থাৎ বেশি কম্পাঙ্কের দিকে সরবে।

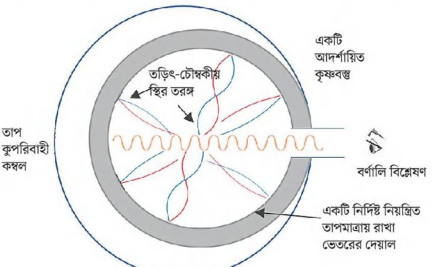

চিত্র ১ : একটি আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর ভেতরের দেয়াল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ শোষণ ও বিকিরণ করে। সেই তরঙ্গকে আবার ফোটন কোয়ান্টা হিসেবেও ভাবা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন, কৃষ্ণবস্তুর ভেতরে যে গহ্বর আছে, সেখানে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয় (চিত্র ১)। ওই সময়ে পরমাণু ও এর মধ্যে ইলেকট্রনের অবস্থান সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা বলতেন, দেয়ালে অবস্থিত একধরনের দোলক (Oscillator) থেকে তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে। এই দোলক যে কম্পাঙ্কে দুলবে, সেই কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। একেকটি কম্পাঙ্কের জন্য একেকটি তরঙ্গ। যেসব তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ওই গহ্বরে সৃষ্টি হবে, সেগুলোকে স্থির তরঙ্গ (Standing Wave) হতে হবে, যেখানে তাদের তড়িৎক্ষেত্রের (বা ভেক্টরের) মান গহ্বরের দেয়ালে শূন্য হবে (চিত্র ১)। একটি নির্দিষ্ট আকারের গহ্বরে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের কয়টি তরঙ্গের উপস্থিতি সম্ভব? আমরা যদি সেই সংখ্যাটি জানি, তবে সেটিকে তরঙ্গের গড় শক্তি দিয়ে গুণ করলে বিকিরিত প্রাবল্যের মানটি পাওয়া যেতে পারে। এটি যেহেতু একটি ত্রিমাত্রিক গহ্বর, সে জন্য গণনাটি একটু জটিল; এই মানটিকে 'স্বাধীনতার মাত্রা' বা 'ডিগ্রি অব ফ্রিডম' বলা হয়। একে দশার পরিমাণও বলা যায় এবং সেটির মান তরঙ্গের কম্পাঙ্কের বর্গের (~ f^2) সমানুপাতিক।

কীভাবে সেটা গণনা করা যাবে, তার মধ্যে না গিয়ে চূড়ান্ত ফলটি লিখছি—একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের পরিক্ষেপে (যেমন f থেকে f + df) এই দশার মানটি হলো $8\pi f^2/c^3$। এখানে c হলো আলোর গতিবেগ। খুব সরলভাবে কি এই রাশিটির ব্যাখ্যা করা যায়? মনে করুন, ১০০ থেকে ১২০০ মানের কম্পাঙ্কের মধ্যে যদি ৫টি তরঙ্গের উপস্থিতি সম্ভব হয়, তাহলে আমি যদি ৫-কে প্রতিটি তরঙ্গের শক্তি দিয়ে গুণ করি, তবে ওই তরঙ্গদের মোট শক্তির ঘনত্ব (বা প্রাবল্য) পাওয়া যাবে, যেটা ২ নম্বর চিত্রে y-অক্ষে দেখানো হয়েছে। র‍্যালে-জিন্সের রাশিটিতে তরঙ্গের গড় শক্তি ধরা হয়েছে kT (এখানে k বোলজম্যান ধ্রুবক ও T হলো তাপমাত্রা), কাজেই মোট প্রাবল্য হবে $8\pi f^2 kT/c^3$। তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নিরবচ্ছিন্ন, এই ধারণার ওপর নির্ভর করে, কম্পাঙ্কের মানের ওপর ইন্টিগ্রেশন করে গড় শক্তি kT পাওয়া গিয়েছিল।

র‍্যালে-জিন্সের রাশি দিয়ে পরীক্ষালব্ধ বর্ণালিটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। দেখা গেল, কম্পাঙ্কের মান কম হলে সেটি পরীক্ষালব্ধ মানের সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু উঁচু কম্পাঙ্কে তা মেলে না। এটি তখনকার দিনে অতিবেগুনি বিপর্যয় (Ultraviolet catastrophe) বলে আখ্যায়িত করা হতো। বিপর্যয় কেন? কারণ, অতিবেগুনি আলোর কম্পাঙ্কে র‍্যালে-জিন্স রাশিটির মানটি প্রায় অসীম হয়ে যাচ্ছিল (চিত্র ২)। এরপর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ১৯০০ সালে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দেখালেন, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণকে নিরবচ্ছিন্ন না ধরে যদি ছোট ছোট পৃথক অংশের (কোয়ান্টা বা কোয়ান্টাম) মিলিত ফল হিসেবে ধরা যায়, তবে এমন একটি রাশি পাওয়া যাবে, যেটি কৃষ্ণবস্তুর বর্ণালিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে। প্রতিটি কোয়ান্টার শক্তি হবে hf, যেখানে h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক।

প্ল্যাঙ্ক অনুমান করলেন, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ hf, 2hf, 3hf, ... এ রকম কোয়ান্টা দিয়ে গঠিত এবং সেগুলোকে সিরিজ বা ধারায় যোগ করে দেখালেন যে কোয়ান্টার গড় শক্তি kT নয় বরং $hf/(e^{hf/kT}-1)$। কীভাবে প্ল্যাঙ্ক এটি আহরণ করলেন, তা আজকের আলোচনার বাইরে রাখতে হবে। তবে একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয়—এই সমস্যায় প্ল্যাঙ্ক এনট্রপির ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। শক্তিকে (বা কণাদের) কত বেশি 'উপায়ে' বিন্যস্ত বা বিতরণ করা যায়, এনট্রপি সেটার পরিমাপক। একটা বদ্ধ সিস্টেম ক্রমাগত বেশি এনট্রপির দিকে যাবে এবং তাপীয় সাম্যাবস্থায় সর্বোচ্চ এনট্রপিতে থাকবে। এই কথা বা শক্তিরা সর্বোচ্চ এনট্রপিতে থাকবে—এই নীতি অবলম্বন করে প্ল্যাঙ্ক দেখালেন, বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টাম কণাদের শক্তিকে hf দিয়ে বর্ণনা করা যায়।

প্ল্যাঙ্কের পদ্ধতি কোয়ান্টাম (বিযুক্ত বা পৃথক অর্থে) ধারণাকে প্রথম সামনে নিয়ে এল, কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই এই পদ্ধতিটি নিয়ে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। কারণ, প্ল্যাঙ্ক তাঁর রাশিটি আহরণ করতে ধ্রুপদি বিজ্ঞানের সঙ্গে নতুন কোয়ান্টাম বিজ্ঞান মিশিয়েছিলেন। ধ্রুপদি বিজ্ঞান কোনটি? খেয়াল আছে, কৃষ্ণবস্তুর গহ্বরে কত ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে, তা গণনা করা হয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ কম্পাঙ্কের ইন্টিগ্রেশন দিয়ে। এটা হলো ধ্রুপদি বা সনাতন পদ্ধতি। অথচ প্ল্যাঙ্ক শক্তি গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেন একক বিচ্ছিন্ন কণার কোয়ান্টাম ধারণা। গণনার ক্ষেত্রে বিকিরণ একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণা হতে পারে না। হয় তাকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ হিসেবে ভাবতে হবে, না হলে পৃথক কণা হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই যে অসামঞ্জস্য, সেটা পরবর্তী ২০ বছর ডিবাই, আইনস্টাইন, নার্নস্ট, কামেরলিঙ্গ ওনেস, পাউলি এ রকম আরও দু-একজন বিজ্ঞানী দূর করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলেন না। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মেঘনাদ সাহা ঢাকায় এলেন এবং সত্যেন বসুর সঙ্গে প্ল্যাঙ্ক পদ্ধতির যৌক্তিক অসামঞ্জস্য দূর করতে এসব বিজ্ঞানীর গবেষণা নিয়ে আলোচনা করলেন। তত দিনে মেঘনাদ সাহা আলোর কোয়ান্টাম চরিত্রকে তাঁর গবেষণায় ব্যবহার করছিলেন, বিশেষত আলোর কণার যে ভরবেগ $p = hf/c$ আছে, এই ধারণাটি।

> বর্তমানে যেসব কণার কোয়ান্টাম স্পিন পূর্ণ সংখ্যা, সেগুলোকে সত্যেন বসুর সম্মানে বোসন কণা বলে অভিহিত করা হয়, এরা সবাই বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে

এর দুই মাসের মধ্যে সত্যেন বসু প্ল্যাঙ্কের রাশিটি প্রণয়ন করলেন কোনো যৌক্তিক অসামঞ্জস্য ছাড়াই। ৪ জুন ১৯২৪ সালে আইনস্টাইনকে একটি গবেষণাপত্র পাঠালেন একটি চিঠিসহ, 'এটি সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন, তা জানতে আমি উদ্বিগ্ন আছি। আপনি লক্ষ করবেন যে প্ল্যাঙ্কের সূত্রের $8\pi f^2/c^3$ সহগটি আমি সনাতনী তড়িৎ-গতিবিদ্যার ওপর নির্ভর না করেই নির্ণয় করেছি; আমি কেবল ধরে নিয়েছি, দশা-স্থানে একেবারে প্রাথমিক অঞ্চলের আয়তন হলো h^3....'

এটি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। প্ল্যাঙ্ক ধরে নিয়েছিলেন, কৃষ্ণবস্তুর দেয়াল একধরনের দোলক তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং সেই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক দোলকের কম্পাঙ্কের সমান। ১৯২৪ সালের মধ্যে অবশ্য দোলকগুলো যে পরমাণু, তা বোঝা গিয়েছিল। সত্যেন বসু দোলকের ধারণার মধ্যেই গেলেন না; বরং ধরে নিলেন, কৃষ্ণবস্তুর গহ্বর আলোর কোয়ান্টাম কণিকা (বর্তমানে আমরা যাকে ফোটন বলি) দিয়ে ভর্তি। এরপর বের করলেন একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের পরিক্ষেপে (f থেকে f + df) কটি অবস্থান (বা কটি দশায়) ওই কণাগুলো নিতে পারে। এর জন্য ব্যবহার করলেন কোয়ান্টার ত্রিমাত্রিক ভরবেগ p_x, p_y, p_z এবং ত্রিমাত্রিক স্থান x, y, z। ত্রিমাত্রিক ভরবেগের মান হলো $p = hf/c$। এই হিসাবে কতগুলো দশা

$$A^s = \frac{8\pi f^2}{c^3} V df^s \quad (১)$$

$$\frac{A^s!}{p_0^s! p_1^s! p_2^s! \ldots} \quad (২)$$

$$N^s = 0 \cdot p_0^s + 1 \cdot p_1^s + 2 \cdot p_2^s + \cdots \quad (৩)$$

$$W = \prod_s \frac{A^s!}{p_0^s! p_1^s! p_2^s! \ldots} \quad (৪)$$

$$W = \prod_s \frac{(N^s - 1 + P^s)!}{N^s! (P^s - 1)!} \quad (৫)$$

চিত্র ৩ : সত্যেন বসুর ১৯২৪-এর প্রবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি রাশি ও সমীকরণ

থাকতে পারে? এই পদ্ধতিতে df কম্পাঙ্কের পরিক্ষেপে এবং V স্থানিক ঘন আয়তনে সেলেন বসু পেলেন $4\pi f^2/c^3 Vdf$ মানটি। এরপর একটি আলোর কণার দুটি পোলারাইজেশন (কৌণিক ভরবেগের কারণে) দশার জন্য শেষোক্ত রাশিটিকে ২ দিয়ে পূরণ করলেন (চিত্র ৩, সমীকরণ ১)। চন্দ্রশেখর রামনের একটি পেপার থেকে আমরা জানতে পারি, সত্যেন বসুর মূল গবেষণাপত্রে ২ দিয়ে পূরণ করার ব্যাপারে ওপরের ব্যাখ্যাটি দেওয়া ছিল, কিন্তু আইনস্টাইনের অনুবাদে সেই ব্যাখ্যাটি বাদ পড়ে। পরে প্রমাণিত হয় যে ফোটন কণার দুটি কৌণিক ভরবেগ আছে, একটি ফোটনের গতির দিকে, অন্যটি গতির বিপরীতে।

এর পরের পদক্ষেপে সত্যেন বসু ব্যবহার করলেন নতুন সংখ্যায়ন পদ্ধতি। এতে একটি কোয়ান্টাম আলোক কণাকে অন্য একটি আলোক কণা থেকে আলাদা করা সম্ভব নয় (তারা অভিন্ন) এবং একটি কোয়ান্টাম দশায় একাধিক কণা থাকতে পারে। ৩ নম্বর চিত্রের (২) নম্বর রাশিটি দেখাচ্ছে N^s কোয়ান্টাকে A^s সংখ্যক দশায় বা খোপে কতভাবে বণ্টন করা সম্ভব (এখানে A^s সংখ্যার মানকে (১) নম্বর সমীকরণ দিয়ে পাওয়া যায়)। এখানে s হলো একটি কোয়ান্টার স্তর (df)। বসু p_0^s সংখ্যক খোপে শূন্য কোয়ান্টা, p_1^s সংখ্যক খোপে একটি, p_2^s সংখ্যক খোপে দুটি কোয়ান্টা—এভাবে জিনিসটা ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো যোগ করলে যে N^s সংখ্যক কোয়ান্টা পাওয়া যাবে, সেটা (৩) নম্বর সমীকরণে দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ২টি খোপ আছে, যেখানে কোনো কোয়ান্টা নেই, ৩টি খোপে ১টি কোয়ান্টা এবং ৪টি খোপে ২টি করে কোয়ান্টা আছে। তাহলে মোট কোয়ান্টার পরিমাণ হলো ০×২ + ১×৩ + ২×৪ = অর্থাৎ মোট ১১টি কোয়ান্টা এই শক্তিস্তরে রয়েছে। যদি কোনো নির্দিষ্ট শক্তির (বা কম্পাঙ্কের) পরিব্যাপ্তিতে ১০০০টি কোয়ান্টা থাকে এবং ওই ব্যাপ্তিতে (বা স্তরে) যদি ১০টি দশা বা খোপ থাকে তবে প্রতিটিতে ০ থেকে আরম্ভ করে ১০০০টি পর্যন্ত কোয়ান্টা থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি খোপে কতগুলো কোয়ান্টা থাকবে, তার ওপর বাধানিষেধ নেই।

৩ নম্বর চিত্রের (১) নম্বর অভিব্যক্তিটি একটি নির্দিষ্ট df (বা শক্তির) পরিক্ষেপ বা পরিব্যাপ্তির জন্য, এর পরবর্তী df-এর জন্যও একই বণ্টন প্রযোজ্য। আবার প্রতিটি নির্দিষ্ট বণ্টনের জন্য অন্য df-গুলোর সব বণ্টন সম্ভব। অর্থাৎ প্রথম df-এর জন্য W-এর মান ১০ আর পরেরটির জন্য ৫ হলে, দুটি মিলিয়ে ১০×৫ = ৫০টি উপায়ে কোয়ান্টাগুলো ছড়িয়ে থাকতে পারে। কাজেই s যদি df সারি বা ধারার সংখ্যা হয়, তবে প্রথমটির জন্য s = ১ এবং দ্বিতীয়টির জন্য s = ২ হবে। এভাবে বহুসংখ্যক s-এর গুণফল আমাদের সামগ্রিক বিতরণের মানটি দেবে, এটা (৪) নম্বর সমীকরণে দেখানো হয়েছে।

৩ নম্বর চিত্রের (২) নম্বর সমীকরণ একেবারে নতুন নয়, বোলজম্যানও এ রকম একটি সংখ্যায়ন ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সেখানে কোয়ান্টার বা প্রভেদশূন্য কণার ধারণা ছিল না। পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী লাডিসলাস নাটানসন ১৯১১ সালে অবশ্য একই রূপের পরিসংখ্যান প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজটি সামগ্রিকভাবে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণকে কোয়ান্টাম দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখার কারণে উপেক্ষিত থাকে। আর সত্যেন বসু নাটানসনের কাজটি সম্বন্ধে যে অবগত ছিলেন, এ রকম কোনো ধারণা পাওয়া যায় না (তাঁর ছাত্র অধ্যাপক পার্থ ঘোষ তা-ই মনে করেন, রেফারেন্সে ওনার লেখাটি দেখতে পারেন)।

বর্তমান কোয়ান্টাম তত্ত্বের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রণয়ন করতে (৪) নম্বর সমীকরণ ব্যবহার করা হয় না; বরং (৫) নম্বরটি ব্যবহৃত হয়। এটার ব্যাখ্যায় বলা যায়, N-সংখ্যক প্রভেদশূন্য কোয়ান্টাকে যখন P-সংখ্যক নির্দিষ্ট খোপে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি খোপে যদি কতসংখ্যক কোয়ান্টা থাকবে, তার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে (৫) নম্বর সমীকরণটি ব্যবহার করা যায়। যদি N-এর মান ১ থেকে অনেক বড় হয়, তখন (৪) এবং (৫) নম্বর সমীকরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আমরা জানি কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণে কোয়ান্টা বা ফোটনের সংখ্যা বিশাল, কাজেই এই দুটি সমীকরণ মূলত একই।

(৫) নম্বর সমীকরণটি নিয়ে একটু বিশদভাবে বলি। ধরা যাক, আমাদের তিনটি শক্তির স্তর আছে, E1, E2, E3। প্রথম E1 স্তরটিতে আবার ৩টি কোয়ান্টা, ২টি দশা বা খোপে, অবস্থান করছে। এর মানে ওই ৩টি কোয়ান্টার বণ্টন ৪টি উপায়ে হতে পারে—(০, ৩), (৩, ০), (১, ২), (২, ১)। (৫) নম্বর সমীকরণ অনুযায়ী (৩ - ১ + ২)!/((৩)!(২ -১)!) = ৪টি উপায়ই পাওয়া যাবে। এবার ধরা যাক E2-তে ৪টি কোয়ান্টা আছে, ৩টি খোপের মধ্যে। তাহলে সেখানে মোট বিতরণের সংখ্যা হবে (৪ - ১ + ৩)!/((৪!)(৩ -১)!) = ১৫টি। তারপর ধরা যাক, E3-তে ৫টি কোয়ান্টা আছে ৩টি দশাতে। সেখানে বণ্টনসংখ্যা হবে (৫ - ১ + ৩)!/((৫!)(৩ -১)!) = ২১টি। তাহলে এই তিনটি শক্তিস্তরে ৪ × ১৫ × ২১ = ১,২৬০টি উপায়ে কোয়ান্টাগুলো ছড়িয়ে থাকতে পারে।

যেকোনো বিচ্ছিন্ন বা পৃথক সিস্টেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি তাপীয় সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়, যেখানে এনট্রপির মান সর্বাধিক। কাজেই এর পরের পদক্ষেপটি ছিল (৪) নম্বর সমীকরণে (অথবা ৫ নম্বরে) যে সিস্টেমটি পাওয়া গেছে, তার এনট্রপির সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ করা। এনট্রপির মান নির্ধারণের জন্য বোলজম্যান একটি সমীকরণ দিয়ে গিয়েছিলেন $S = k\ln(W)$, যেখানে k হলো বোলজম্যানের ধ্রুবক, আর W হলো (৪) অথবা (৫) নম্বর সমীকরণ অনুযায়ী বণ্টনসংখ্যা, অর্থাৎ কতভাবে কোয়ান্টারা বিভিন্ন দশায় থাকতে পারে। সেই সর্বাধিক মানটি পাওয়ার জন্য সত্যেন বসু দুটি সংরক্ষণ নীতির ভিত্তিতে ক্যালকুলাস এবং ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার পদ্ধতি (তত দিনে এটি ছিল একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি) ব্যবহার করেছিলেন। দুটি সংরক্ষণ নীতির একটি ছিল সিস্টেমে মোট শক্তি সংরক্ষিত থাকবে এবং অপরটি হলো মোট কোয়ান্টা সংখ্যা সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু বসু শুধু প্রথমটি ব্যবহার করে (২) নম্বর চিত্রে প্ল্যাঙ্ক যে রাশিটি প্রণয়ন করেছিলেন (২ নম্বর চিত্রে), তা পেলেন। কোয়ান্টা সংখ্যার সংরক্ষণ যে তাঁর গণনায় লাগেনি, সেটি প্রমাণ করে যে কোয়ান্টা বা ফোটনসংখ্যা সংরক্ষিত থাকে না। কারণ, পারমাণবিক বিকিরণ ও শোষণে একটি ফোটন থেকে একাধিক ফোটন কিংবা একাধিক ফোটন থেকে একটি বা কোনো ফোটন না-ও পাওয়া যেতে পারে।

সত্যেন বসুর এই কাজটির প্রকৃত উদ্ভাবনী দিকটি হলো কোয়ান্টা কণাকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয় যেন তারা

প্রভেদশূন্য, একে অপর থেকে পার্থক্য করা যায় না। এই প্রভেদশূন্যতার মূল ভিত্তিটাই হলো বিভিন্ন কোয়ান্টাগুলো বণ্টন করার সময় কোন কোয়ান্টা কোন দশায় যাবে, তা নির্দিষ্ট না করে শুধু প্রতি দশায় কতটি কোয়ান্টা যাবে, তার ওপর মনোযোগ দেওয়া।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সত্যেন বসুর এই কাজের দুটি দিক আছে—একটি হলো কোয়ান্টাম কণার ভরবেগ ও স্থানের ওপর ভিত্তি করে দশার ঘনত্ব বের করা, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কোয়ান্টাম কণাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে (ধ্রুপদি তরঙ্গবিজ্ঞানের ওপর নয়), আর দ্বিতীয়টি হলো ওই কণাদের শক্তি নির্ণয়ের জন্য একটি নতুন সংখ্যায়ন তত্ত্ব দেওয়া। এই দ্বিতীয় অংশের জন্যই তিনি বিখ্যাত, যাকে আমরা বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বলি। কিন্তু আইনস্টাইন যখন তাঁর গবেষণাপত্রটি অনুবাদ করেন, তখন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে তাঁর সুপারিশপত্রে আইনস্টাইন শুধু প্রথম অবদানটির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

১৯২৫ সালে আইনস্টাইন সত্যেন বসুর পরিসংখ্যান ব্যবহার করলেন গ্যাসীয় অণুর ওপর এবং ধারণা করলেন চরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় পরমাণুগুলো বোস কণার মতো আচরণ করবে, অর্থাৎ একটি অভিন্ন কোয়ান্টাম দশায় থাকবে। বস্তুর এই অবস্থাকে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট (অতিঘনীভূত অবস্থা) বলা হয়। ২.১৭ কেলভিন তাপমাত্রার নিচে তরল হিলিয়াম এ ধরনের একটি অতি তরল অবস্থায় উপনীত হয়, যখন তার সব পরমাণুই সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে থাকে, তাদের স্পিনের মান শূন্য হয় এবং তারা সান্দ্রতা হারিয়ে অবাধে ছড়িয়ে পড়ে। ২০০১ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তিনজন বিজ্ঞানীকে, যাঁরা রুবিডিয়াম ও সোডিয়াম পরমাণুর গ্যাসে এ অবস্থাটি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বর্তমানে যেসব কণার কোয়ান্টাম স্পিন পূর্ণ সংখ্যা, সেগুলোকে সত্যেন বসুর সম্মানে বোসন কণা বলে অভিহিত করা হয়, এরা সবাই বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে। পল ডিরাক ১৯৪০ সালে 'বোসন' নামটি প্রথম ব্যবহার করেন। ফোটন W এবং Z বোসন, গ্লুয়ন—এদের সবার স্পিন ১, আবার হিগস কণা, পাই মেসন—এদের স্পিন ০। এরা সবাই বোসন কণা।

সত্যেন বসু তাঁর পরিসংখ্যান প্রণয়ন করেছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উষালগ্নে। শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ ফাংশন বা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব তখনো প্রণীত হয়নি। এই কাজটি তিনি করেছিলেন, বিজ্ঞান গবেষণার মূল কেন্দ্রগুলো থেকে বহুদূর থেকে, বিশ্বের সার্বিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মৌলিক অবদান রাখার প্রত্যয় থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি এই কালজয়ী প্রবন্ধ লেখেন, সেটি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির গৌরবময় ঐতিহ্য। ১৯৬৪ সালে লাইফ ম্যাগাজিন *দ্য সায়েন্টিস্ট* নামে একটি বই প্রকাশ করে, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা কেমন করে একটি সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করছেন, তা নিয়ে আলোচনা ছিল। ওই বইটি আমাদের ঢাকার বাসায় ছিল, সেখানে সত্যেন বসুর একটি লক্ষণীয় দুর্লভ ছবি ছিল। সেই ১৯৬৮ সালে, আমার স্কুলছাত্র অবস্থায়, বিদেশি একটি বইয়ে, বাঙালি এক বিজ্ঞানীর ছবি দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। সেই বিস্ময়, তাঁর কাজ সম্বন্ধে আজ লিখতে গিয়ে, আজও কাটেনি।

লেখক : অধ্যাপক, মোরেনো ভ্যালি কলেজ, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

গ্রন্থসূচি : Partha Ghose, *Bose Statistics : A historical perspective*, *S. N. Bose Collected Scientific Papers (1994)*, S N Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta

গণিতের সমস্যা ৯৬

শ্রেণি অনুসারে নিচের গণিতের সমস্যার সমাধান করে আমাদের কাছে পাঠান। সঠিক সমাধানদাতা তিনজন পাবেন রকমারি ডটকমের সৌজন্যে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর। খামের ওপর **গণিতের সমস্যা ৯৬** লিখুন। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে লিখুন।

এবারের সমস্যাগুলো বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ২০২২-এর বিভাগীয় অলিম্পিয়াড থেকে বাছাই করা।

প্রাইমারি

6টি একই দৈর্ঘ্যের রেখাংশ দিয়ে আবদ্ধ ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল কত?

জুনিয়র

কন্যাপুরে একটি পরিবারে যতক্ষণ কন্যাসন্তান জন্ম না নেয়, সে পরিবার সম্পূর্ণ হয় না। কন্যাসন্তান না হওয়া পর্যন্ত তারা সন্তান গ্রহণ করতে থাকে। যেকোনো সময়ে সেখানে কন্যা ও পুত্রের অনুপাত কত? ধরো, কন্যা বা পুত্রসন্তান হওয়ার সম্ভাবনা সমান।

সাধারণ

ঠিক চারটি 4 এবং যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ফ্যাক্টরিয়াল ও দশমিক ব্যবহার করে 0 থেকে 50 পর্যন্ত সব পূর্ণসংখ্যা তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ $44 - 44 = 0$।

গণিতের সমস্যা ৯৫-এর বিজয়ী

তানজিম মাহফুজ, উপশহর, নাটোর

মাহবুবা আখতার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মাসুম আহমেদ, শেরপুর

গ্রন্থনা : **নাফিস তিহাম**, একাডেমিক সমন্বয়ক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি

সুডোকু ০১ উত্তর

৪	৯	৮	৭	৩	১	৬	৫	২
১	৩	৭	২	৫	৬	৪	৮	৯
৫	২	৬	৮	৪	৯	৭	৩	১
৯	৭	১	৫	৮	২	৩	৪	৬
৬	৪	৫	৯	৭	৩	১	২	৮
২	৮	৩	১	৬	৪	৫	৯	৭
৮	৫	৪	৬	৯	৭	২	১	৩
৩	৬	২	৪	১	৮	৯	৭	৫
৭	১	৯	৩	২	৫	৮	৬	৪

সুডোকু ০২ উত্তর

২	৩	৮	৪	৫	৬	৭	৯	১
৫	৭	৬	৮	৯	১	৩	৪	২
১	৪	৯	২	৩	৭	৫	৬	৮
৩	৬	৭	৯	৮	২	১	৫	৪
৮	২	১	৬	৪	৫	৯	৭	৩
৪	৯	৫	১	৭	৩	২	৮	৬
৬	৮	৩	৭	২	৯	৪	১	৫
৭	১	২	৫	৬	৪	৮	৩	৯
৯	৫	৪	৩	১	৮	৬	২	৭

বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী। পৃথিবীর অর্ধেক কণার নাম রাখা হয়েছে তাঁর নামে, বোসন। চলুন, এই বিজ্ঞানীর জীবনের জানা-অজানা কিছু বিষয় দেখে নিই একনজরে।

> যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয়তো বিজ্ঞান বোঝেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৮৯৪। মৃত্যু : ৪ জুন ১৯৭৪

বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান

১৯২৪ সালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে আইনস্টাইনের কাছে চিঠি লেখেন সত্যেন বসু। পরে আইনস্টাইন তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এটিই বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান।

বসু-স্মরণে বিশ্বকবি

১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একমাত্র বিজ্ঞানবিষয়ক বই *বিশ্বপরিচয়* উৎসর্গ করেন সত্যেন বসুকে।

মহাবিশ্বের অর্ধেক কণা তাঁর নামে

মহাবিশ্বের অর্ধেক মৌলিক কণার নামকরণ হয়েছে সত্যেন বসুর নামে। এই কণার নাম বোসন কণা। বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে বলে এমন নামকরণ করা হয়েছে।

ভারতে ফেরা

দেশভাগের সময় ভারতে ফিরে যান অধ্যাপক সত্যেন বসু। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করে।

নোবেলের জন্য মনোনীত একাধিকবার

সত্যেন বসু একাধিকবার নোবেলের জন্য মনোনয়ন পেলেও এ পুরস্কার রয়ে গেছে অধরা। তবে তাঁর এবং আইনস্টাইনের কাজ নিয়ে গবেষণা করে নোবেল পেয়েছেন অনেক বিজ্ঞানী।

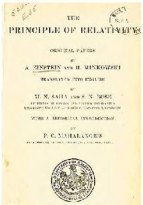

আপেক্ষিকতার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ

আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে, জার্মান ভাষায়। ১৯১৯ সালে সেই বই প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহা। বইটির নাম ছিল *প্রিন্সিপল অব রিলেটিভিটি*।

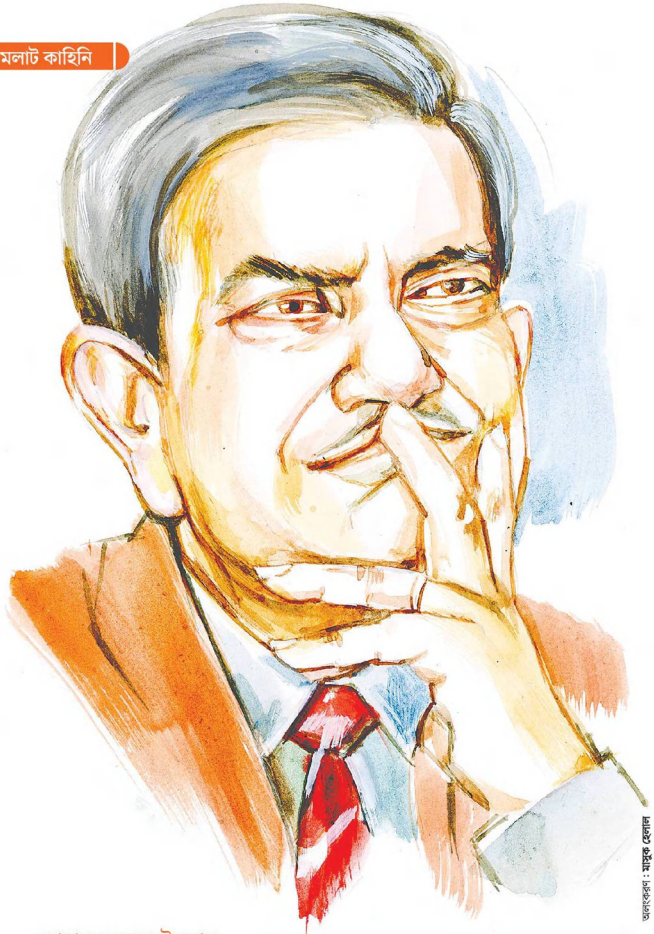

অলংকরণ : মাসুক হোসাইন

জামাল নজরুল ইসলাম

মহাবিশ্বের নিয়তির সন্ধানে

প্রদীপ দেব

আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের সমাধান করেছেন তিনি। অনুসন্ধান করেছেন মহাবিশ্বের ভবিতব্য। গণিতের ভাষায় যেমন তা প্রকাশ করেছেন, তেমনি লিখেছেন সাধারণ মানুষের জন্যও। জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞান বই লেখার অগ্রপথিক জামাল নজরুল ইসলামের গবেষণার ভেতরের কথা...

বিজ্ঞানজগতে বাংলাদেশের গর্ব বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান ও কসমোলজিতে তাঁর যুগান্তকারী অবদান রয়েছে। তাঁর মৌলিক গবেষণাগুলোকে প্রধানত পাঁচটি ধাপে ভাগ করা যায়—কণাপদার্থবিজ্ঞানের ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশনের গাণিতিক বিশ্লেষণ, জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের সঠিক সমাধান, মহাজাগতিক ধূলিকণার ক্ষেত্র সমীকরণের সমাধান, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি ও গাণিতিক অর্থনীতি।

জামাল নজরুল ইসলামের মৌলিক গবেষণা শুরু হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন তিনি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি শুরু করেছেন। তাঁর পিএইচডি সুপারভাইজার ছিলেন ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী জন ক্লেটন টেইলর। তিনি আবার অধ্যাপক আবদুস সালামের ছাত্র। ১৯৫৬ সালে আবদুস সালাম ও রিচার্ড ইডেনের তত্ত্বাবধানে তিনি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে পিএইচডি করেছেন। এরপর যোগ দিয়েছিলেন লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে, অধ্যাপক আবদুস সালামের ডিপার্টমেন্টে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৯৬১ সালে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস ও থিওরেটিক্যাল ফিজিকস ডিপার্টমেন্টে। সেই বছরই সেখানে পিএইচডি গবেষণা শুরু করেন জামাল নজরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন জন টেইলরের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের একজন। তখন মাত্র ২২ বছরের তরুণ তিনি, আর তাঁর সুপারভাইজার জন টেইলরের বয়স তখন ৩১।

গাণিতিক দক্ষতায় তুখোড় জে এন ইসলামের আগ্রহ পার্টিক্যাল ফিজিকসের সমসাময়িক গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রতি। কাজ শুরু করলেন মাত্র তিন বছর আগে, ১৯৫৮ সালে উদ্ভাবিত 'ম্যান্ডেলস্ট্যাম ভেরিয়েবল' নিয়ে।

যাঁর নামে এই ভেরিয়েবল, সেই অধ্যাপক স্ট্যানলি ম্যান্ডেলস্ট্যাম তখন ইংল্যান্ডেই ছিলেন। বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিকসের অধ্যাপক তখন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে জন্ম তাঁর। বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৮ সালে পোস্টডক্টরেট ফেলোশিপ করার সময় তিনি কণাপদার্থবিজ্ঞানে রিলেটিভিস্টিক, তথা আপেক্ষিকতার আলোকে গাণিতিক হিসাবের সুবিধার্থে উদ্ভাবন করেন একটা বিশেষ সুবিধাজনক পদ্ধতি, যা তাঁর নামেই পরিচিতি লাভ করে—ম্যান্ডেলস্ট্যাম ভেরিয়েবলস। দুটি কণার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটার সময় তাদের শক্তি, ভরবেগ ও পারস্পরিক কৌণিক অবস্থান—সব কটি কার্যকরভাবে গাণিতিক সমীকরণে প্রকাশ করার জন্য ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন খুব কার্যকর।

ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন উদ্ভাবনের ১০ বছর আগে, ১৯৪৮ সালে মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের হিসাব-নিকাশ সহজ করার জন্য উদ্ভাবন করেছেন 'ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম'। ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন অনেকটা সে রকম পদ্ধতি হলেও ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর প্রথম গবেষণাতেই চতুর্মাত্রিক ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের সঙ্গে ম্যান্ডেলস্ট্যাম পদ্ধতির সমন্বয় ঘটালে কী হয়, তা গাণিতিকভাবে করে দেখালেন। ১৯৬২ সালের ১৮ মে তিনি *জার্নাল অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিকস*-এ প্রকাশের জন্য পাঠালেন নিজের প্রথম গবেষণাপত্র 'মডিফায়েড ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন ফর হেভি পার্টিকেলস'। সে বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়।[১]

নিজের প্রথম গবেষণাপত্রে জামাল নজরুল ইসলাম ম্যান্ডেলস্ট্যামের পদ্ধতি অনেক ভারী কণার ওপর প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে ভারী কণার ক্ষেত্রে ফোর্থ অর্ডার ফাইনম্যান অ্যামপ্লিচ্যুড কাজ করে না। এ গবেষণায় তিনি বার্গম্যান-ওয়েইল ফর্মুলা ব্যবহার করেছেন। অনেকগুলো গাণিতিক চলক বা ম্যাথমেটিক্যাল ভেরিয়েবলকে একসঙ্গে সমন্বয় করে ইন্টিগ্রাল ফর্মুলায় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বার্গম্যান-ওয়েইল ফর্মুলা খুব কার্যকর গাণিতিক পদ্ধতি। ১৯৩৫ সালে ফরাসি গণিতবিদ আঁদ্রে ওয়েইল এবং ১৯৩৬ সালে পোলিশ-আমেরিকান গণিতবিদ ষ্টিফেন বার্গম্যান আলাদাভাবে এই ফর্মুলা আবিষ্কার করেন।

প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্র 'অ্যানকনডম অ্যান্ড কাম্পস অ্যান্ড দ্য ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন' প্রকাশের জন্য পাঠান *জার্নাল অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিকস*-এ। ১৯৬৩ সালের জুলাই সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়।[২] এ গবেষণাতেও তিনি ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম ও ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশনের সমন্বয়ের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করেন ল্যান্ডাউ সমীকরণে প্রয়োগের মাধ্যমে। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে কণার বিক্ষেপণের মাত্রা হিসাব করার জন্য ফাইনম্যান ইন্টিগ্রালের শর্তগুলো নির্ধারিত হয় ল্যান্ডাউ সমীকরণের মাধ্যমে। সোভিয়েত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী লেভ ল্যান্ডাউ ১৯৬২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তরল হিলিয়ামের সুপারফ্লুইডিটি আবিষ্কারের জন্য।

জামাল নজরুল ইসলামের মৌলিক গবেষণা শুরু হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন তিনি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি শুরু করেছেন। তাঁর পিএইচডি সুপারভাইজার ছিলেন ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী জন ক্লেটন টেইলর

১৯৬২ সালে অধ্যাপক জন টেইলরের গ্রুপে যোগ দেন সদ্য পিএইচডি করা ব্রিটিশ তরুণ পিটার ভিনসেন্ট ল্যান্ডশফ। জামাল নজরুল ইসলামের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় অংশ নিতে পিটারও খুব আগ্রহী। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই জন টেইলর, পিটার ল্যান্ডশফ ও জামাল নজরুল ইসলাম যৌথভাবে 'সিঙ্গুলারিটি অব দ্য রেজ্জে অ্যামপ্লিচ্যুড' নামে একটা গবেষণাপত্র তৈরি করেন।

ইতালির তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী টুলিও রেজ্জে ১৯৫৯ সালে স্ক্যাটারিং ম্যাট্রিক্স প্রপার্টিজ গবেষণাপত্রে প্রকাশ করেছেন উচ্চশক্তির কণার বিক্ষেপণের সূত্র 'রেজ্জে থিওরি'। রেজ্জে অ্যামপ্লিচ্যুড হিসাব করা হয় বিক্ষেপণের মাত্রা থেকে। কণাপদার্থবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল এই গবেষণাপত্র। পরে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, স্ট্রিং থিওরি এবং অন্যান্য ভারী কণার মিথস্ক্রিয়ার হিসাব কষতে ব্যবহৃত হয় এ গবেষণাপত্র। জামাল নজরুল ইসলাম রেজ্জে অ্যামপ্লিচ্যুডের সীমাবদ্ধতা নির্ণয় করেছেন ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে *ফিজিক্যাল রিভিউ*য়ে প্রকাশিত হয় এই গবেষণাপত্র।[৩]

১৯৬৩ সালের এপ্রিলে জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর পরের গবেষণাপত্র 'লিডিং ল্যান্ডাউ কার্ভস অব সাম ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম' পাঠালেন ইতালির *নোভো সিমেন্টো* জার্নালে।

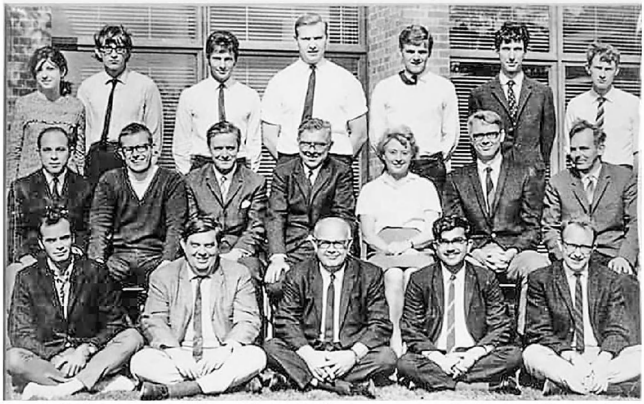

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৭ সালে তোলা এক ছবিতে অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে জামাল নজরুল ইসলাম (সামনের সারিতে বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়)। দ্বিতীয় সারির মাঝখানে বসে আছেন বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল।

এই গবেষণায় ল্যান্ডাউ কার্তের সঙ্গে ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের উপযোগিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ম্যান্ডেলস্ট্যাম রিপ্রেজেন্টেশন পরীক্ষা করে দেখা হয়। অবশ্য এই গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে অক্টোবর মাসে। তার আগেই তিনি তাঁর পিএইচডি থিসিস জমা দিয়েছেন।[৪]

১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যতটুকু গবেষণা করেছেন জামাল নজরুল ইসলাম, সেটুকু যথেষ্ট ছিল তাঁর পিএইচডি থিসিসের জন্য। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি তাঁর পিএইচডি থিসিস 'অ্যানালাইটিক প্রপার্টিস অব এস-ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টস' (Analytic Properties of S-Matrix Elements) জমা দেন। এর মাধ্যমে মাসখানেক পরই অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি।

তবে পিএইচডির ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির ফিজিকস অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগে যোগ দেন রিসার্চ ফেলো হিসেবে। কোরিয়ান বংশোদ্ভূত পদার্থবিজ্ঞানী ইয়ং সু কিম মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে ১৯৬২ সালে যোগ দিয়েছেন মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে। ইউএস এয়ারফোর্স আর ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের দুটি রিসার্চ গ্র্যান্টের আওতায় তিনি তাঁর প্রথম রিসার্চ ফেলো হিসেবে বেছে নেন জামাল নজরুল ইসলামকে।

মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে দুই বছর ছিলেন জামাল নজরুল ইসলাম। কণাপদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ গণিত নিয়েই গবেষণা চালিয়ে গেছেন সেখানেও। ১৯৬৫ সালের জুনে *ফিজিক্যাল রিভিউ*য়ে প্রকাশিত হলো ডক্টর কিমের সঙ্গে তাঁর যৌথ গবেষণাপত্র 'অ্যানালিটিক প্রপার্টি অব থ্রি-বডি ইউনিটারিটি ইন্টিগ্রাল'।[৫] এই গবেষণা তাঁর আগের গবেষণাগুলো থেকে কিছুটা আলাদা হলেও বিষয়ের দিক থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র নয়। বিক্ষেপণের সময় তিনটি কণার মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার জটিল গাণিতিক শর্তাবলি নির্ণয়ে ম্যান্ডেলস্ট্যাম প্রেজেন্টেশন ও ফাইনম্যান ডায়াগ্রামের বিশ্লেষণ এ গবেষণাতেও আছে।

জামাল নজরুল ইসলাম ম্যান্ডেলস্ট্যাম প্রেজেন্টেশন-সংক্রান্ত অত্যন্ত জটিল যেসব গাণিতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, সেগুলো পরে কণাপদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির গণিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যে স্ট্রিং থিওরি তখনো জন্ম লাভ করেনি, সেই স্ট্রিং থিওরিতেও এসব গাণিতিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯৬৫ সালের শরৎকালে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আবার কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এলেন জামাল নজরুল ইসলাম। এবার যোগ দিলেন প্রফেসর ফ্রেড হয়েলের কসমোলজি গ্রুপে। গাণিতিক কসমোলজির গবেষণা শুরু করলেন এখানে এসে।

১৯৬৪ সালে রয়্যাল সোসাইটির *প্রসিডিংস*-এ পরপর তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকার।[৬] এই তিনটি গবেষণাপত্রে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির আলোকে স্টেডি-স্টেট থিওরির সমর্থনে তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা দুজন। স্টেডি-স্টেট থিওরির সমর্থনে তাঁরা একটি কাল্পনিক ক্রিয়েশন ফিল্ড বা সি-ফিল্ডের ধারণা প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্ব সঠিক হলে মহাবিশ্ব প্রসারিত হলেও তার গড় ঘনত্ব সব সময় অপরিবর্তিত থাকবে। সে ক্ষেত্রে অনবরত নতুন পদার্থের উদ্ভব হতে হবে। সি-ফিল্ডের প্রভাবে শূন্য থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর উদ্ভব হতে থাকে যতটুকু দরকার হয়, যখন দরকার হয়। গ্রিন ফাংশনের সাহায্যে সি-ফিল্ডের গাণিতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকার। তাঁরা ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের সাহায্যে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার প্রয়োগে ভরক্ষেত্রের গাণিতিক বিশ্লেষণও করেন গ্রিন ফাংশনের মাধ্যমে। এ জন্য মহাকর্ষের একটি নতুন তত্ত্বও দেন তাঁরা।[৭] সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই তাঁদের এই নতুন তত্ত্বে। কেবল পার্থক্য হলো সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এবং মহাকর্ষ ধ্রুবকের মান নির্ধারণে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা সমীকরণের বিশেষ পর্যায়ে [যখন Rik = 0] শূন্য মহাবিশ্ব বা মহাশূন্য অবস্থা তৈরি হতে পারে, যেখানে শূন্যস্থানের জন্যও স্থান দরকার হয়। ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকারের মহাকর্ষের নতুন তত্ত্ব অনুসারে, শূন্যস্থান একেবারেই শূন্য। তাকে স্থান

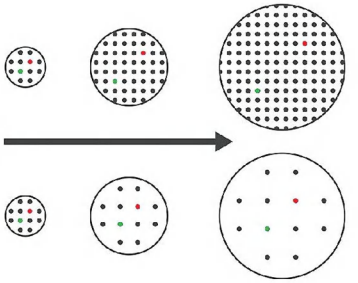

মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং এর গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গত শতকের মাঝামাঝি দুটি বিপরীতধর্মী তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বির্তক ছিল। এর একটি স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্ব, অন্যটি বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। জামাল নজরুল ইসলাম ফ্রেড হয়েলের তত্ত্বাবধানে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

দেওয়ার কোনো দরকার নেই। শুধু তা-ই নয়, যেকোনো স্থানে কমপক্ষে দুটি কণা থাকতে হবে এই নতুন তত্ত্ব অনুসারে।

জামাল নজরুল ইসলাম ফ্রেড হয়েলের গ্রুপে যোগ দিয়েই প্রথম যে গবেষণাটি করলেন, সেটা হয়েল ও নারলিকারের সি-ফিল্ড, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ও ম্যাস-ফিল্ডে যেভাবে গ্রিন ফাংশন প্রয়োগ করা হয়েছে, সেভাবে ডিরাক-ফিল্ডে গ্রিন ফাংশনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা।

ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকারের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনার পর জামাল নজরুল ইসলাম রয়্যাল সোসাইটির *প্রসিডিংস*-এ প্রকাশ করেন 'গ্রিন ফাংশন ফরমুলেশন অব দ্য ডিরাক ফিল্ড ইন কার্ভড স্পেস'।[৮] বলা যায়, এ গবেষণাপত্রের মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর গবেষণার নতুন ক্ষেত্র—সাধারণ আপেক্ষিকতা। তিনিই প্রথম গ্রিন ফাংশনের মাধ্যমে ডিরাক-ফিল্ডের গাণিতিক ফর্মুলা আবিষ্কার করেন।

১৯৬৬ সালে ফ্রেড হয়েল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ইনস্টিটিউট অব থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম ইনস্টিটিউট এটাই। এর আগে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরি স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোলার ফিজিকস অবজারভেটরি। ১৯৭২ সালে এই তিন বিভাগকে একত্র করে প্রতিষ্ঠা করা হয় কেমব্রিজ ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোনমি। থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হলেন ফ্রেড হয়েল। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন জয়ন্ত নারলিকার। জামাল নজরুল ইসলামও এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন গবেষণা-বিজ্ঞানী হিসেবে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত বিজ্ঞানী হিসেবে গবেষণা করেছেন।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি ইনস্টিটিউটে গবেষণা করে সাতটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন জামাল নজরুল ইসলাম। এ সময় তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ, যেগুলো ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি বা গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক গাণিতিক ভিত্তি।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি ইনস্টিটিউটে গবেষণা করে সাতটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন জামাল নজরুল ইসলাম। এ সময় তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল জেনারেল সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করে আবার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকারের নতুন মহাকর্ষ তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে গ্রিন ফাংশন ফর্মুলা কেমন হবে, সে-সম্পর্কিত জামাল নজরুল ইসলামের গবেষণাপত্র যে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তা আগেই বলেছি। এবার তিনি যেকোনো ধরনের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে কণাগুলোর মিথস্ক্রিয়ার গ্রিন ফাংশন ফর্মুলা প্রকাশ করলেন তাঁর 'গ্রিন ফাংশন ফরমুলেশন অব ইন্টারঅ্যাকশনস অব আর্বিটারি ফিল্ডস' গবেষণাপত্রে।[৯]

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে কাজ করার সময় ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকারের নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব-সংক্রান্ত ক্ষেত্র-সমীকরণের ওপর জামাল নজরুল ইসলামের শেষ গবেষণাপত্র 'কনফর্মাল ফ্রেমস অ্যান্ড ফিল্ড ইকুয়েশনস ইন আ কনফর্মাল থিওরি অব গ্র্যাভিটেশন' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে।[১০] তত দিনে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং অন্যান্য প্রমাণ সামনে আসার পর ফ্রেড হয়েলের স্টেডি-স্টেট ইউনিভার্সের ধারণা নিষ্প্রভ হয়ে যেতে শুরু করেছে। জামাল নজরুল ইসলাম এবার তাঁর গবেষণায় সরাসরি নক্ষত্রের দিকে মনোযোগ দিলেন।

নক্ষত্রের গঠনসংক্রান্ত গবেষণাপত্র পড়তে শুরু করলেন তিনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মানিয়ানের *ইস্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অব স্টেলার স্ট্রাকচার* বইটি শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। নক্ষত্রের গঠন সম্পর্কে জানার জন্য এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য বই সে সময় আর ছিল না। জামাল নজরুল ইসলাম এই বই পড়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের পদার্থবিজ্ঞান-কসমোলজি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৬৯ সালের মে মাসের মধ্যে জামাল নজরুল ইসলাম শেষ করলেন তাঁর 'সাম জেনারেল রিলেটিভিস্টিক ইনইকুয়ালিটিস ফর আ স্টার ইন হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম'

গবেষণাপত্রের প্রথম খণ্ড। প্রফেসর ফ্রেড হয়েল তা পাঠিয়ে দিলেন রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে। ১৯৬৯ সালে সোসাইটির *মান্থলি নোটিশ*-এ তা প্রকাশিত হলো।[১১] ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করলেন এই গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ড। জয়ন্ত নারলিকারের মাধ্যমে সেটা প্রকাশিত হলো ১৯৭০ সালে।[১২] নক্ষত্রগুলোর অভ্যন্তরীণ গ্যাসের চাপ এবং বাইরের মহাকর্ষ বলের চাপের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতার যেসব গাণিতিক চলক বিভিন্ন ধরনের শর্ত মেনে চলে, সেগুলো সহজীকরণ করেছেন জামাল নজরুল ইসলাম এই দুটি গবেষণাপত্রে। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণ সমাধানে তাঁর এই পদ্ধতি খুব কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি ইনস্টিটিউটে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (ক্যালটেক) যোগ দেন ভিজিটিং অ্যাসোসিয়েট হিসেবে। এক বছর ছিলেন সেখানে। তখন তাঁর হোস্ট ছিলেন প্রফেসর কিপ থর্ন। বিশ্বখ্যাত এই ইনস্টিটিউটে তখন নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় জামাল নজরুল ইসলামের।

১৯৭২ সালে জামাল নজরুল ইসলাম ক্যালটেক থেকে সিয়াটলের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাস্ট্রোনমির সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তাঁর হোস্ট ছিলেন প্রফেসর জর্জ ওয়ালেরস্টেইন ও ফিলিপ কার্ল পিটারস। প্রফেসর ওয়ালেরস্টেইন নক্ষত্রের গঠন ও তাদের রাসায়নিক বিবর্তনের নিউক্লিওসিন্থেসিস নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই সময়। আর প্রফেসর পিটারস কাজ করছিলেন উইক ফিল্ড গ্র্যাভিটেশনাল স্ক্যাটারিং সম্পর্কে। তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে জামাল নজরুল ইসলাম কসমোলজির বিভিন্ন বিষয় শিখেছেন, যা তাঁর গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে আবার কয়েক মাসের জন্য প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে গেলেন জামাল নজরুল ইসলাম। সেখানে সেবার তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয় গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের সঙ্গে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত জামাল নজরুল ইসলামের নক্ষত্রের হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম-সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলো পড়ে ফ্রিম্যান ডাইসন জামাল নজরুল ইসলামের গবেষণার প্রতি খুব আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে তৈরি হয় সম্মানজনক বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে লন্ডনের কিংস কলেজে ফলিত গণিতের লেকচারার পদে যোগ দেন জামাল নজরুল ইসলাম। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি কসমোলজিতে সাধারণ আপেক্ষিকতার প্রায়োগিক দিকের ব্যাপারে ব্যাপক পড়াশোনা করেন।

১৯৭৫ সালে জামাল নজরুল ইসলাম যোগ দেন কার্ডিফের ইউনিভার্সিটি কলেজের (বর্তমানে কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি) অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমি ডিপার্টমেন্টে। এ ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর হিসেবে যোগ দিয়েছেন শ্রীলঙ্কান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নলিন চন্দ্র বিক্রমসিঙ্গে এবং লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছেন মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী বার্নার্ড শোব্জ। কার্ডিফে জামাল নজরুল ইসলামের গবেষণা সহযোগী ছিলেন বার্নার্ড শোব্জ। তাঁরা একসঙ্গে গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেছেন।

১৯৭৮ পর্যন্ত কার্ডিফ কলেজে ছিলেন জামাল নজরুল ইসলাম। এ সময় তাঁর গবেষণার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির আইনস্টাইনের সমীকরণের সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে তাঁর ৯টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতা বিষয়ে, বিশেষ করে আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের সমাধান বিষয়ে।

মহাবিশ্বে স্থান-কালের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মহাকর্ষ বল দিয়ে। এর সঠিক গাণিতিক ব্যাখ্যার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব হলো আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতা, যা মহাকর্ষ বলের ফিল্ড ইকুয়েশন বা ক্ষেত্র সমীকরণে প্রকাশ করা যায়। অন্যদিকে মহাবিশ্বের বস্তু ও শক্তিগুলোর মধ্যে যে অবিরাম জটিল মিথস্ক্রিয়া চলছে, তা ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমীকরণ হলো ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ, যেগুলো তড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব রিপ্রেজেন্ট করে। মহাবিশ্বের গণিত বুঝতে হলে এই দুটির কোনোটা ছাড়া চলবে না। আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ মহাবিশ্বকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। জামাল নজরুল ইসলাম আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের বিভিন্ন অবস্থার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন তাঁর অনেকগুলো গবেষণাপত্রে।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হলো আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ সমাধানে তাঁর গবেষণাপত্র 'আ ক্লাস অব অ্যাপ্রোক্সিমেট স্টেশনারি সলিউশনস অব দ্য আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনস'।[১৩]

আইনস্টাইনের ভ্যাকুয়াম ফিল্ড ইকুয়েশনের ঘূর্ণমান অবস্থার

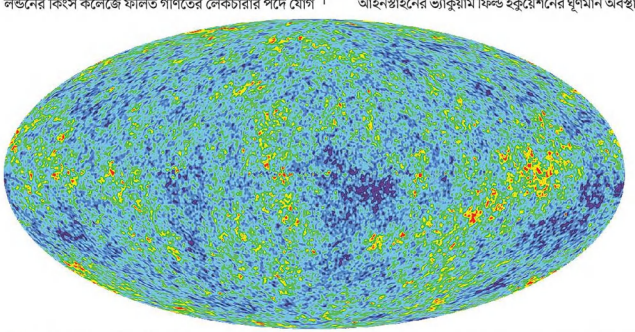

মহাবিশ্বের মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের মানচিত্র। এই বিকিরণ মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের জোরালো প্রমাণ। ১৯৬৫ সালে আকস্মিকভাবে এই বিকিরণ শনাক্ত হওয়ার পর স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়।

সমাধান তখনো পাওয়া যায়নি। জামাল নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালে আইনস্টাইনের সেসব সমীকরণের সমাধান প্রকাশ করলেন তাঁর 'আ ক্লাস অব অ্যা প্রো ক্সি মে ট এ ক্স টে রি ও র রোটেটিং সলিউশনস অব আইনস্টাইন'স ইকুয়েশনস'।[১৪]

এর কয়েক মাস পরই প্রকাশিত হলো আইনস্টাইনের সমীকরণের সার্বিক ঘূর্ণনের সমাধানসমৃদ্ধ গবেষণাপত্র 'অন দ্য এক্সিস্ট্যান্স অব আ জেনারেল রোটেটিং সলিউশন অব আইনস্টাইন'স ইকুয়েশনস'।[১৫]

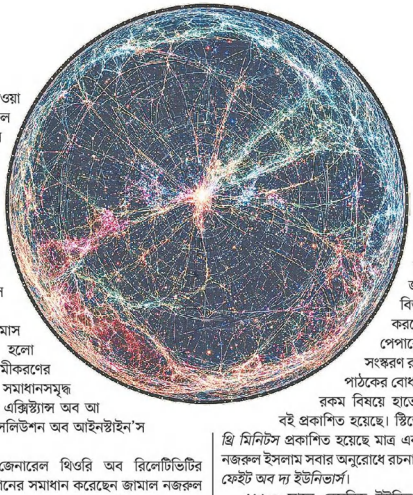

ⓒ কাল্পনিক সি-ফিল্ড বা ক্রিয়েশন ফিল্ড নামের একটি ধারণা স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয়।

আইনস্টাইনের *জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি* স্ট্যাটিক ফিল্ড ইকুয়েশনের সমাধান করেছেন জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালের দুটি গবেষণাপত্রে। স্ট্যাটিক ফিল্ড সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। শুধু তা-ই নয়, স্ট্যাটিক ফিল্ডে কোনো ঘূর্ণন থাকে না, অর্থাৎ স্পেস টাইমে কোনো ভাঁজ পড়ে না। সেখানে মহাকর্ষক্ষেত্র সময়ের অপেক্ষক নয়। আইনস্টাইনের ভ্যাকুয়াম ফিল্ডকে স্ট্যাটিক ফিল্ড ধরে তার জেনারেল রিলেটিভিস্টিক সমাধান করেছেন জামাল নজরুল ইসলাম ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'অন দ্য স্ট্যাটিক ফিল্ড ইন জেনারেল রিলেটিভিটি' গবেষণাপত্রে।[১৬] পরের বছর প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ড 'অন দ্য স্ট্যাটিক ফিল্ড ইন জেনারেল রিলেটিভিটি : টু'।[১৭] এই গবেষণায় স্ট্যাটিক ফিল্ড তথা ভ্যাকুয়াম ফিল্ড ইকুয়েশনের সমাধান করা হয়েছে আগের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে।

সেই সময় (১৯৭৭-৭৮) জামাল নজরুল ইসলামের মতো আর কেউ এত বিস্তারিত ও বহুমাত্রিক গণিতের মাধ্যমে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সমাধান করেননি। স্টিফেন হকিং এ ব্যাপারে নিজে আগ্রহী হয়ে জামাল নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাঁর পেপারগুলো রয়েল সোসাইটির *প্রসিডিংস*-এ প্রকাশ করার জন্য।

জামাল নজরুল ইসলামের পরবর্তী গবেষণাপত্র 'আ ক্লাস অব এক্সাক্ট ইন্টেরিয়র সলিউশনস অব দ্য আইনস্টাইন-ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনস' রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য পাঠালেন স্টিফেন হকিং।[১৮]

১৯৭৮ সালে লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে যোগ দেন জামাল নজরুল ইসলাম। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। এ সময়ে তিনি কসমোলজি ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণাপত্র রচনা করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে তাঁর ছয়টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্রগুলোর মধ্যে আছে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতির গাণিতিক রূপরেখা, আদি পৃথিবীর ব্ল্যাকহোলগুলোর বর্তমান অবস্থান কী হতে পারে, চার্জিত কণার ওপর জেনারেল রিলেটিভিটি থিওরির সমীকরণ এবং তাদের সম্ভাব্য সমাধান।

১৯৭৭ সালে রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির *কোয়ার্টারলি জার্নাল*-এ একটি ছোট্ট টেকনিক্যাল পেপার 'পসিবল আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' প্রকাশ করেন জামাল নজরুল ইসলাম। এরপর নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়াইনবার্গ, ফ্রিম্যান ডাইসন, স্টিফেন হকিং, জয়ন্ত নারলিকার প্রমুখ বিজ্ঞানী তাঁকে অনুরোধ করলেন এই টেকনিক্যাল পেপারের একটি জনপ্রিয় সংস্করণ রচনা করতে, যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে। এর আগে এ রকম বিষয়ে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছে। স্টিভেন ওয়াইনবার্গের *ফার্স্ট থ্রি মিনিটস* প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক বছর আগে। জামাল নজরুল ইসলাম সবার অনুরোধে রচনা করলেন *দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স*।

১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে এই বই প্রকাশিত হওয়ার পর মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। পরে জামাল নজরুল ইসলামকে অনুসরণ করে এ রকম বই আরও অনেকে লিখেছেন। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত স্টিফেন হকিংয়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই *আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম*-এর আইডিয়া *দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স* থেকে উৎসারিত। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস ১৯৯৪ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর জনপ্রিয় বই *দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস*, যা জামাল নজরুল ইসলামের বইটির পরের অধ্যায় বলা চলে। পল ডেভিস তাঁর বইয়ের সাবটাইটেলে উল্লেখ করছেন 'কনজেকসার্স অ্যাবাউট দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স'।

আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটিতে রোটেটিং ফিল্ড বা ঘূর্ণমান ক্ষেত্রের গাণিতিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন জামাল নজরুল ইসলাম। তাঁর গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে রচনা করেছেন তাঁর আরেকটি মাইলফলক গবেষণাগ্রন্থ *রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি*। ১৯৮৫ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এই বই মূলত গবেষক ও শিক্ষার্থী-গবেষকদের জন্য লেখা। এ গবেষণার জন্য কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি জামাল নজরুল ইসলামকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি দেয়।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান মানুষের কৌতূহল মেটায়, হয়তো বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহও কিছুটা তৈরি করে। কিন্তু সত্যিকারের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দরকার বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থ। জামাল নজরুল ইসলামের *দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স*-এ মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে গণিত ব্যবহার না করে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভাষা গণিত। মহাবিশ্বের উৎস, গঠন, বিবর্তন ও পরিণতির গণিত বুঝতে হলে একটা নির্ভরযোগ্য বইয়ের দরকার। সেই প্রয়োজনীয়তাও মিটিয়েছেন জামাল নজরুল ইসলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি রচনা করেছেন *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি*। ১৯৯২ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর সব সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য এই বই প্রধান বইতে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত

হয়েছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে এর অনলাইন সংস্করণ।

দেশের টানে দেশে ফিরে এসে তিনি স্থাপন করেছেন আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে শতাধিক গবেষক তৈরি হয়েছে। কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি গাণিতিক অর্থনীতির গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সঠিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারিত হলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারবে। ২০০৮ থেকে ২০১৩—এই পাঁচ বছরে তিনি গাণিতিক অর্থনীতি বিষয়ে ২০টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

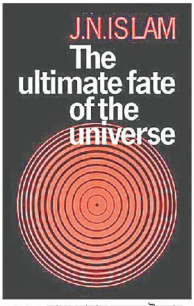

১৯৮৩ সালে জামাল নজরুল ইসলাম রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত বই *দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স*

লেখক : শিক্ষক ও গবেষক, আরএমআইটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

টীকা ১ : Modified Mandelstam Representation for Heavy Particles, *Journal of Mathematical Physics*, Volume 3, Number 6, November-December 1962, pages 1098-1106.

টীকা ২ : Acnodes and Cusps and the Mandelstam Representation, *Journal of Mathematical Physics*, Volume 4, Number 7, pages: 872-878, July 1963.

টীকা ৩ : Physical Review, Volume 130, Number 6, pages: 2560-2565, 15 June 1963

টীকা ৪ : Leading Landau curves of some Feynman diagrams, Nuovo Cimento, Volume 30, pages: 259-265, 1963

টীকা ৫ : Analytic property of three- body unitarity integral. Physical Review, Volume 138, Number 5B, pages: B1222-B1229, 7 June 1965

টীকা ৬ : Proceedings of Royal Society, Volume A282, pages: 178-183, 184-190, 191-207, 1964

টীকা ৭ : F. Hoyle and J.V. Narlikar, A New theory of gravitation, Proceedings of the Royal Society, Volume A282, pages: 191-207, 1964

টীকা ৮ : Green function formulation of the Dirac field in curved space, Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences, Volume 294, Number 1439, pages: 437-448, October 1966

টীকা ৯ : Green function formulation of interactions of arbitrary fields, Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Volume 65, Number 3, pages: 759-771, May 1969

টীকা ১০ : Conformal frames and field equations in a conformal theory of gravitation, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Volume 67, Number 2, pages: 397-414, March 1970

টীকা ১১ : Some general relativistic inequalities for a star in hydrostatic equilibrium, Monthly notices of the Royal Astronomical Society, Volume 145, Number 1, pages: 21-29, July 1969

টীকা ১২ : Monthly notices of the Royal Astronomical Society, Volume 147, Number 4, pages: 377-386, April 1970

টীকা ১৩ : A class of approximate stationary solutions of the Einstein- Maxwell equations, General Relativity and Gravitation, Volume 7, Number 8, pages: 669-680, January 1976]

টীকা ১৪ : A class of approximate exterior rotating solutions of Einstein's equations, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Volume 79, Number 1, pages: 161-166, January 1976

টীকা ১৫ : On the existence of a general rotating solution of Einstein's equations, General Relativity and Gravitation, Volume 7, Number 10, pages: 809-815, 1976]

টীকা ১৬ : On the static field in general relativity, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Volume 81, pages: 485-496, 1977.

টীকা ১৭ : On the static field in general relativity: II, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Volume 83, Number 2, pages: 299-306, March 1978

টীকা ১৮ : A Class of Exact Interior Solutions of the Einstein-Maxwell Equations, Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences, Volume 353, Number 1675, pages: 523-531, April 21, 1977. Communicated by S. W. Hawking, F. R. S.

সূত্র : ১. জামাল নজরুল ইসলামের গবেষণাপত্র ও গ্রন্থাবলি [তালিকা দেখুন : এই লেখকের সন্ধানে, বাতিঘর, ঢাকা, ২০২৪, পৃষ্ঠা ২১৬-২২৩]
২. ফ্রিম্যান ডাইসন, টাইম ইইদাউট অ্যান্ড ফিজিকস অ্যান্ড বায়োলজি ইন অ্যান অপেন ইউনিভার্স, *রিভিউ অব মডার্ন ফিজিকস*, বর্ষ ৫১, নম্বর ৩, ১৯৭৯।
৩. পল ডেভিস, *দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস*, বেসিক বুকস, লন্ডন, ১৯৯৭।

দুই চালের মাত ৯৬

এখানে দুটি দাবার ধাঁধা দেওয়া আছে। ধাঁধাগুলো দুই চালে মাত করতে হবে। সঠিক সমাধানদাতা তিনজনের জন্য রকমারি উটকমের সৌজন্যে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর। খামের ওপর অবশ্যই 'দুই চালে মাত ৯৬' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

ধাঁধা ১

ধাঁধা ২

দুই চালে মাত ৯৫-এর উত্তর

ধাঁধা ১ 1. Qxg6+ fxg6 2. Rg7#

ধাঁধা ২ 1. Re8+ Rxe8 2. Qb7#

ধাঁধা ১ ধাঁধা ২

দুই চালে মাত ৯৫-এর বিজয়ী

সাব্বির আহমেদ, ধানমণ্ডি, ঢাকা
তাহসিন মাহফুজ, উপশহর, নাটোর
এস এম মিনহাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

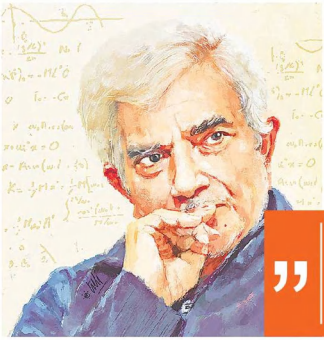

অলংকরণ : তুলি

বাংলাদেশি পদার্থবিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তি গড়ার নেপথ্য কারিগরদের একজন। চলুন, এই বিজ্ঞানীর জীবনের জানা-অজানা কিছু বিষয় দেখে নিই।

> আমাদের দেশে বিদেশি সাহায্যের দরকার নেই। বিদেশি সাহায্য বন্ধ হলেই আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখব, বাধ্য হয়েই শিখব।

জামাল নজরুল ইসলাম

জন্ম : ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। মৃত্যু : ১৬ মার্চ ২০১৩

গণিতের প্রতি আগ্রহ

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর গণিতে ট্রাইপস (স্নাতক) ডিগ্রি নেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ থেকে। তিন বছরের এই উচ্চতর গণিত কোর্স তিনি সম্পন্ন করেন মাত্র দুই বছরে।

প্রথম গবেষণাপত্র

তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে *জার্নাল অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিকস* জার্নালে। এর বিষয়বস্তু ছিল পদার্থবিজ্ঞানী স্টানলি ম্যান্ডেলস্ট্যামের উদ্ভাবিত ম্যান্ডেলস্ট্যাম পদ্ধতির ওপর।

দেশে ফেরা

১৯৮১ সালে দেশে ফিরে তিনি সরাসরি অধ্যাপক পদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে যোগ দেন।

সাধারণ আপেক্ষিকতা নিয়ে গবেষণা

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর ৯টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সারা জীবনে তিনি ৫৫টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

হকিং ও ফাইনম্যান

১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালটেকে যোগ দেন তিনি। সেখানে পরিচয় হয় রিচার্ড ফাইনম্যানের সঙ্গে। দীর্ঘদিন তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু কাছাকাছি হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে স্টিফেন হকিংয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় আরও আগে, ১৯৬৬ সালে।

বইপত্র

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে একাধিক গবেষণাপত্রের পাশাপাশি সবার জন্য লিখেছেন *দ্য আলটিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স* (১৯৮৩, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস)। এ ছাড়া বাংলায় ৩টি ও ইংরেজিতে ৪টি বই লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন ২টি বই।

কী ও কেন?

আমাদের চোখ-কান দুটি, কিন্তু নাক কেন একটি

আব্দুল কাইয়ুম আঁকা : অনিন্দ্য মুস্তাসির

সেটা অন্য ব্যাপার, স্যার। এই ধরুন টিফিন তো মজার খাবার হতে হবে, ঠিক কার টিফিন বক্সে কী মজার টিফিন আছে, সেটা তো আগে জানা দরকার। সে জন্য একটি নাকই যথেষ্ট! দু-তিনটা নাক থাকলে নিখুঁতভাবে মজার টিফিনটা বের করতে গন্ডগোল লেগে যাবে!!!
কিন্তু নাক একটা হলেও নাসারন্ধ্র তো দুটি।
সেটা তো হবেই। না হলে এক মুখে দুই নাক হলে তো বুনো পশু হয়ে যাব। চেহারায় কোনো সৌন্দর্য থাকবে না।
এটা বড় ব্যাপার। মানুষের চোখ-কান-নাক-মুখ এমনভাবে সাজানো যে শরীরের ডান-বাঁ অংশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিসম অবস্থান সবাইকে কাছে টেনে নেয়। সহজেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।
ঠিক বলেছেন, স্যার।
দুই চোখ আছে বলে আমরা কোনো বস্তুকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার তুলনামূলক দূরত্ব ও গভীরতা বুঝতে পারি।
দুটি কান আছে বলেই আমরা বুঝতে পারি, কোনো শব্দ ডান দিক থেকে, না বাঁ দিক থেকে... সামনে থেকে, নাকি পেছন দিক থেকে আসছে।
বাকি থাকল নাক। এর দুটি রন্ধ্র না থাকলে তো বিপদ। সর্দি-কাশিতে এক পাশ বন্ধ হয়ে গেলেও অন্য পাশ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো যায়। আর গন্ধ নেওয়ার পথও তো খোলা থাকা চাই, তা-ই না?
প্রতিসম অবস্থায় চোখ-মুখ-নাক-কান আছে বলেই আমরা প্রাণিজগতে বলতে গেলে ১ নম্বরে আছি!!!
তাই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ যত্ন নেওয়া আমাদের সবার কর্তব্য।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি
নাসরীন সুলতানা মিতু
বাঁচাও!
Help!!
কী হলো আবার, ছোট মামা?
ক্কে-ক্কে-কে-কেউ এ-এ-টা স-সরা! প্লিজ!! হে-ল্প... হে-ল্প!
আরেহ! কী কিউট একটা মাকড়সা!
একটা সামান্য মাকড়সা দেখে এত ভয় পেয়ে গেলে হবে মামা? তুমি না রোজ সকালে পঁচিশটা বুকডন দেওয়া মানুষ?
সবকিছু নিয়ে ফাজলামি করবি না তিতলি! মাকড়সাটা কত বড় ছিল দেখেছিস?
কী ব্যাপার, এত হইচই কিসের? তিতলি, বনি, তোমরা কখন এলে?

মামি দেখো, এক মাকড়সা দেখে মামার হার্ট অ্যাটাকের দশা হয়েছে!
হি হি হি! একটা মাকড়সা দেখেই তোমার এই হাল! আর নিজের শরীরে কত মাকড়সা নিয়ে ঘুরছ, তা জানো?
মানে? তুমিও ফাজলামি শুরু করছ?
মামি, একটু ভেঙে বলো না!
আমাদের ত্বক যদি খুব খেয়াল করে দেখো, দেখবে ছোট ছোট একধরনের পোকা রীতিমতো ঘরবসতি করে আছে।
আটপেয়ে এই পোকাগুলো অ্যারাকনিড-জাতীয়, মাকড়সার মতোই আট পা-ওয়ালা।
কী যা-তা বলছ? গায়ের ওপরে উকুন হেঁটে বেড়ালে তো আমরা ঠিকই টের পাই।
এগুলো উকুনের চেয়ে অনেক গুণ ছোট, খালি চোখে এদের দেখা বলা চলে অসম্ভব।
এগুলোর বৈজ্ঞানিক খটোমটো নাম হলো ডেমোডেক্স মাইট। তবে মানুষের ত্বক, বিশেষ করে মুখের ত্বকের ওপর থাকে বলে এদের চলতি নাম হলো ফেস মাইট।
এরা থাকে মূলত চুলের গোড়ায় বা লোমকূপে। দিনের বেলা ঘাপটি মেরে থাকে, আর রাতে খাওয়াদাওয়া, প্রজননের সব কাজ করে। খাবার বলতে ত্বকের খুশকি অথবা ত্বকের নিঃসৃত তেল।

তবে আমাদের শরীরে শুধু এই মাকড়সা-টাইপ প্রাণীই থাকে, এমন না...

বরং মানুষের শরীরে অসংখ্য জাতের ক্ষুদ্র অণুজীব রীতিমতো পাড়া-মহল্লা বানিয়ে বাস করে!

এই অণুজীবদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক।

হ্যাঁ, আমার আঙুলের ফাঁকে একবার খুব চুলকাচ্ছিল, ডাক্তার বলেছিলেন ছত্রাক...একটা খটমটে নামও বলেছিলেন, এখন ভুলে গেছি...

হ্যাঁ, অনেক ছত্রাক ত্বকে চুলকানি, ইনফেকশনসহ নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাই বলে ছত্রাক মানেই যে খারাপ, তা কিন্তু নয়। আমাদের ত্বকে অনেক ধরনের ছত্রাক থাকে, যেগুলো ত্বকের ভারসাম্য ঠিক রাখে।

এ ছাড়া আছে নানা ধরনের ভাইরাস। ভাইরাস শুনলেই তো আমাদের মনে হয় রোগজীবাণুর কথা, কিন্তু সব ভাইরাস রোগ ছড়ায়, এমন নয়। বরং অনেক ভাইরাস ত্বকের ভারসাম্য রাখতেও সাহায্য করে, যেমন কিছু ভাইরাস আছে, যারা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, ফলে ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়তে পারে না।

তবে রোগ ছড়ানোর জন্যও যে অনেক ভাইরাস দায়ী, সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

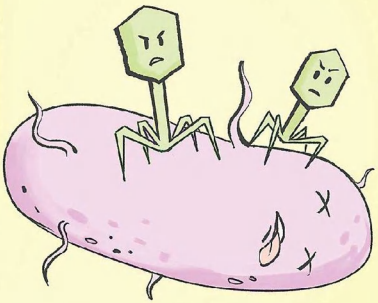

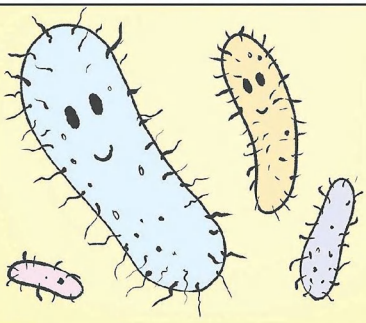

সবশেষে ব্যাকটেরিয়ার কথা বলতেই হয়। আমাদের ত্বকে তো বটেই, সারা শরীরে বাস করে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া। শুধু মুখের কথাই যদি ধরো, মানুষের মুখে ছয়-সাত শ ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে।

এই ক্ষুদ্র জীবদের সংখ্যা অকল্পনীয়! যেমন ধরো, প্রতি এক মিলিলিটার লালায় এক বিলিয়ন পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে!

বলো কী? তাহলে তো আমাদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকার কথা!
আরে, সব ব্যাকটেরিয়া অসুখ বাধায় কে বলল? অনেক ব্যাকটেরিয়া বরং উল্টো আমাদের অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।
ইশশ! সারা গায়ে দুনিয়ার পোকামাকড় হেঁটে বেড়াচ্ছে... চিন্তা করতেই অস্বস্তি হচ্ছে...
আরে ধুর! 'পোকামাকড়' বলছ যেসব অণুজীবকে, তারা বেশির ভাগ আমাদের উপকারই করে।
ত্বক পরিষ্কার রাখলে, আর সাধারণ যত্নটুকু করলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো থাকা যায়।
আর ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করাও জরুরি...
?
...আর ঠিকমতো ঘুমানো...
আঁ... আঁ...
তেলাপোকা!!
আরে চিল...তোর চিৎকার শুনেই তেলাপোকা ভয়ে পালিয়েছে!
তুই না কারাতে ব্ল্যাকবেল্ট? এক তেলাপোকা দেখে এই দশা??
সব সময় ফাজলামি ভালো লাগে না, মামা!

চন্দ্রজয়ী প্রথম নারী

পর্ব : ৫

ব্রাড গান ও স্টিভেন লিস্ট | ভাষান্তর : কাজী আকাশ
আঁকা : ব্রেন্ট ডোনোহোর ও কেইটলিন রিড

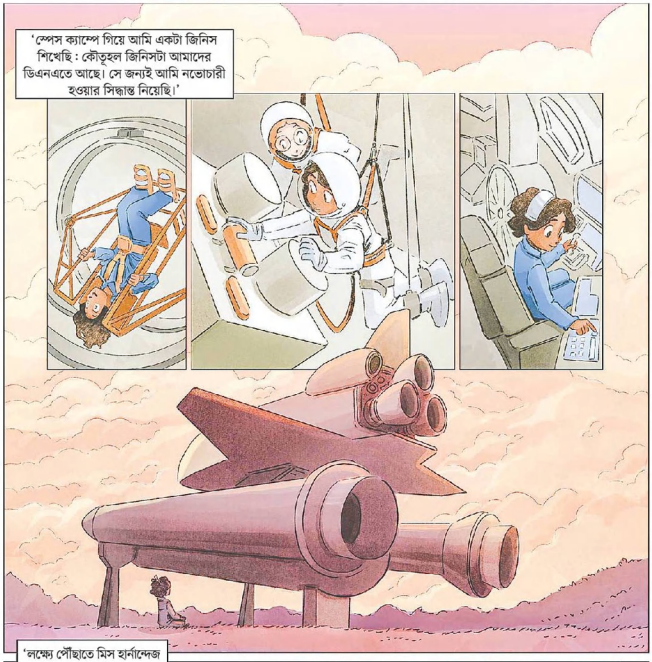

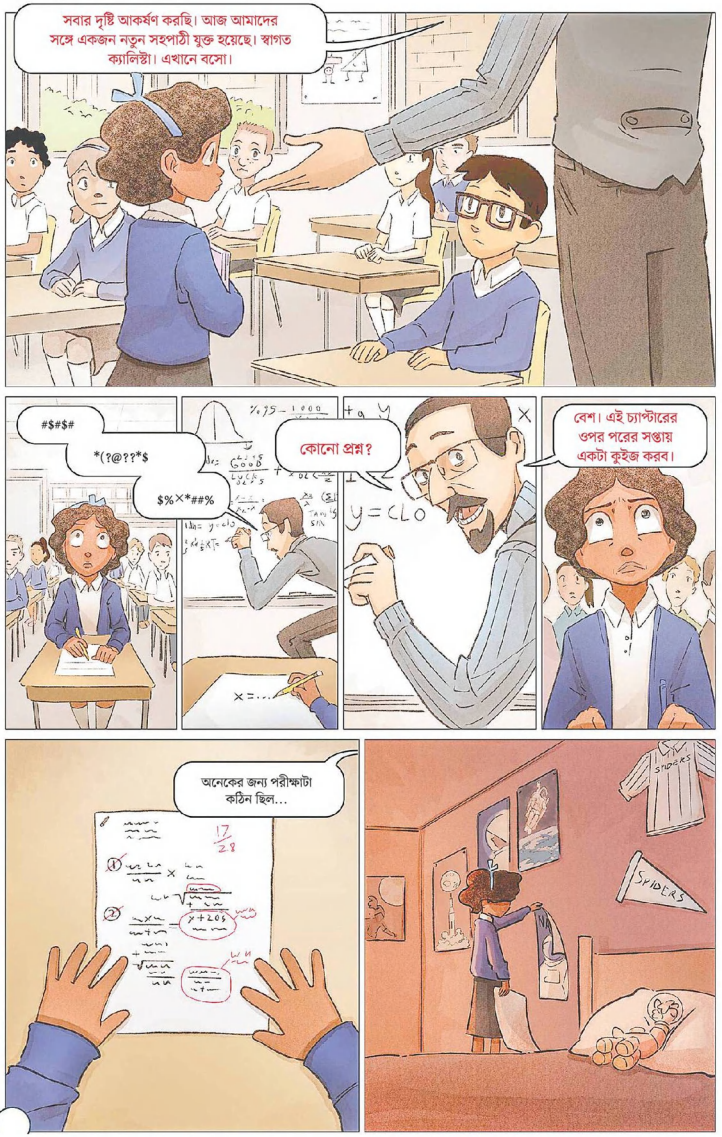
সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ আমাদের সঙ্গে একজন নতুন সহপাঠী যুক্ত হয়েছে। স্বাগত ক্যালিস্টা। এখানে বসো।
#$#$#
(?@??$
$%×*##%
কোনো প্রশ্ন?
বেশ। এই চ্যাপ্টারের ওপর পরের সপ্তায় একটা কুইজ করব।
অনেকের জন্য পরীক্ষাটা কঠিন ছিল...
SPIDERS

কী হয়েছে?
এই প্রোগ্রামের জন্য আমি যথেষ্ট স্মার্ট নই। সত্যি বলতে, আমি অর্ধেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি।
এ জন্য তোমার অস্বস্তি লাগছে...
ভালো লাগছে না।
আমি ক্লাস টেস্টে 'ডি' পেয়েছি বাবা, 'ডি'।
প্রায় ফেলের সমান
তুমি হতাশ করোনি। তবে তোমাকে একটা গোপন কথা বলে রাখি। যত বেশি পড়াশোনা করবে, তত স্মার্ট হবে।
আয়নার দিকে তাকিয়ে যদি অনুভব করতে পারো, তুমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছ, তাহলে এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমাদের চাওয়া নেই।
এখন দেখি, তোমায় সাহায্য করতে পারি কি না...
কখনো ব্যর্থ না হলে তুমি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে না। ঠিক আছে, মিজা?
হ্যাঁ
তোমাকে হতাশ করার জন্য আমি দুঃখিত, বাবা।
...হ্যাঁ, সম্ভবত খুব কঠিন কিছু হবে না।
এটা তো আমারও মাথার ওপর দিয়ে গেল।
আমারও! ভয়ও লাগে।
(চলবে...)

বিজ্ঞানায়োজন

চলছে গণিত অলিম্পিয়াডের নিবন্ধন

শুরু হতে যাচ্ছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৫। ইতিমধ্যেই অনলাইন নিবন্ধন শুরু হয়েছে। এ নিবন্ধন চলবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গণিত উৎসবে অংশগ্রহণ করতে প্রত্যেককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে। আগের বছরগুলোতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্যও নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন লিংক : online.matholympiad.org.bd

অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে চারটি ক্যাটাগরিতে—প্রাইমারি (তৃতীয়-পঞ্চম বা সমমান), জুনিয়র (ষষ্ঠ-অষ্টম বা সমমান), সেকেন্ডারি (নবম ও দশম) ও হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ ও দ্বাদশ)।

চলতি বছর গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজিত হবে তিন ধাপে। অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড, আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড ও জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড আয়োজিত হবে। সেখান থেকে নির্বাচিত বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্ধারিত আঞ্চলিক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড। সবশেষে আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

▪ College Code:1056 ▪ School Code:1098 ▪ EIIN:108572.

ভর্তি–২০২৫ **প্লে/নার্সারি থেকে ৯ম শ্রেণি: বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন**

- **শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি:** ২০০৮ সালে ঢাকা বোর্ড কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
- এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার ফলাফল (বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি ভার্সন):

এইচএসসি	২০২৪ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩১০৭ জন। পাসের হার ১০০%। জিপিএ–৫ অর্জন করে ২০১১ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ–৫ পায় ১৯৬৩ জন। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১০ম ও ৭ম স্থান অর্জন করে।
এসএসসি	২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৭৫০ জন। পাসের হার ১০০% এবং জিপিএ–৫ অর্জন করে ১২৯৮ জন। ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে। তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাইলস্টোন কলেজের অবস্থান প্রথম।
জেএসসি	২০১৯ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ–৫ অর্জন করে ৫৮৯ জন। ২০১৭ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ–৫ অর্জন করে ৮৪৮ জন। জেএসসিতে ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১৩তম, ৭ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
পিইসি	২০১৯ সালে ১১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, শতভাগ পাসসহ জিপিএ–৫ অর্জন করে ১১৩৮ জন। জিপিএ–৫ অর্জনের হার ৯৬.৩৬%। ২০১১ ও ২০১২ সালে ৪র্থ স্থান এবং ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সারাদেশে ৩য় স্থান অর্জন করে।

- **বিশেষ সুবিধা:** মফস্বল এলাকার ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল এবং পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের এবং বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনের ক্লাস পৃথক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতিম, দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- কলেজটি এমএনআরএস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত। উত্তরাস্থ মেইন ক্যাম্পাস ছাড়াও উত্তরার ডিয়াবাড়িতে ২৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাস। খেলাধুলার জন্য বিশাল মাঠ, সার্বিক নিরাপত্তা সম্বলিত সুবিশাল ক্যাম্পাসটিতে ৮০০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে স্কুল ও কলেজটি অবস্থিত।
- ঢাকা মহানগরীর বাইরে গাজীপুর ব্যতীত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের কোন শাখা নেই।
- ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

কর্নেল নুরন্ নবী (অব.)
প্রকল্প পরিচালক ও উপদেষ্টা
প্রাক্তন অধ্যক্ষ–ফৌজদারহাট ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ এবং
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ–রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজ

মোহাম্মদ জিয়াউল আলম
অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন কলেজ

রিফাত নবী আলম
নির্বাহী অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল

৩০ ও ৪৪ গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১ এবং ডিয়াবাড়ি (মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে), তুরাগ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৭৩৩, ০২-৪৮৯৬৩৪৩৭। মোবাইল: ০১৭৭১৫৮১৬৫০, ০১৯২৯৭৬৬৩৭০, ০১৮১৩৬১০১২৭, ০১৯১৬৬৭১৬৪৯, ০১৯১৩৮৪৩১৫৯, ০১৯৪০৩৮৫১৪১, ০১৭১২২৭৯৭৬৮, ০১৯৮৪৫৪৮৬৩৩, ০১৯৩৭৬৭৮২৯৭, ০১৯৭১৮১১৭৯৪।

‘মানবিক বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে ওঠো’

—হাসান খুরশীদ রুমী
বিজ্ঞান কল্পগল্প লেখক ও অনুবাদক

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

হাসান খুরশীদ রুমী বাংলাদেশের সায়েন্স ফিকশনচর্চার অগ্রদূতদের একজন। নিজে সায়েন্স ফিকশন অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন *মৌলিক*-এর। সেবা প্রকাশনীতে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। কাজী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কাজ করেছেন কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের সঙ্গেও। সম্প্রতি তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছে বিজ্ঞানচিন্তা। সায়েন্স ফিকশন নিয়ে তাঁর ভাবনা, শৈশবের কথা ও বর্ণময় জীবনের কথা উঠে এসেছে এ সাক্ষাৎকারে। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ। ছবি তুলেছেন খালেদ সরকার।

বিজ্ঞানচিন্তা : কেমন আছেন?

হাসান খুরশীদ রুমী : ভালো, ভালো, ভালো।

বিজ্ঞানচিন্তা : বাংলাদেশে সায়েন্স ফিকশনচর্চার অগ্রদূতদের একজন বলা হয় আপনাকে। দীর্ঘদিন ধরে নিজে সায়েন্স ফিকশন অনুবাদ করেছেন, *মৌলিক* নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছেন, সম্পাদনাও করেছেন। সায়েন্স ফিকশনের প্রতি আপনার এই আগ্রহ জন্মাল কীভাবে?

হাসান খুরশীদ রুমী : আম্মা ছোটবেলায় একটা বই কিনে দিয়েছিলেন। এখলাসউদ্দিন আহমদের *নেংটি ইঁদুরের গল্প*। আম্মা প্রচুর বই পড়তেন। এখনো পড়েন। বইটা পড়ে দেখলাম, ইঁদুর অ্যাডভেঞ্চারে বের হবে। আমারও ইচ্ছা হলো অ্যাডভেঞ্চার করার। একদিন বাসা থেকে বেরও হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে খুঁজতে তখন লোক পাঠানো হয়েছিল। আসলে বাসার উল্টো দিকে পুকুরপাড়ে বসে ছিলাম। এর চেয়ে দূরে তখন আর যাব কোথায়? ওই বইটা পড়া শেষ করে আম্মাকে চাপ দিতে লাগলাম যে আরেকটা বই কিনে দাও। মা তখন আমাকে আলেকজান্ডার বেলায়েভের *উভচর মানুষ* কিনে দিলেন। অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি তখন একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল। *উভচর মানুষ* পড়ার পর থেকে সায়েন্স ফিকশনের প্রতি আমার দুর্বলতা কাজ করতে শুরু করে।

১৯৭২ সালের কথা। আমি পড়তাম মুসলিম হাইস্কুলে, ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে ছিল স্কুলটা। আম্মা মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে বাংলাবাজার যেতেন। বাংলাবাজারে তখন এত দোকান ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটা টিনশেড বইয়ের দোকান ছিল। এখন যেখানে বড় বিল্ডিং হয়েছে, পাবলিকেশনস হয়েছে, ওখানে তখন টিনশেড ছিল। ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন দেখলাম, ফুটপাতে প্রচুর বইয়ের দোকান। ওখানে *ধূমকেতু* নামে একটা বই পেলাম। প্রচ্ছদে রকেট, চাঁদ এসবের ছবি। দেখেই বুঝতে পারলাম, এটা সায়েন্স ফিকশন। আম্মাকে বললাম, এটা কিনে দাও। মা বললেন, 'এসব বই কেনা লাগবে না।' কিন্তু আমার তো বইয়ের নেশা ধরে গেছে। টিফিনের ফাঁকে দৌড়ে সেখানে যাই, টিফিনের টাকা দিয়ে বই কিনি। স্কুলে থাকতে আমি স্কুলের লাইব্রেরিতে যেতাম। স্কুলের পাশেই ছিল স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স। রাশিয়া থেকে ওরা বই নিয়ে আসত। আমরা গোডাউনের ভেতরে চলে যেতাম। যে বই পছন্দ হতো, নিয়ে নিতাম। আমার এক বন্ধু ছিল। ওকে বললে ও বই ম্যানেজ করে দিত। জলপাইয়ের আচার খাওয়াতে হতো আরকি (হাসি)। এভাবে ধীরে ধীরে সায়েন্স ফিকশনের প্রতি আকৃষ্ট হলাম।

নীলক্ষেতে কিছু সায়েন্স ফিকশনের বই পাওয়া যেত। তখন বাংলাদেশি সায়েন্স ফিকশন লেখার ধারা অত জোরদার হয়নি। আমি তখনো হুমায়ূন আহমেদের বই পড়া শুরু করিনি। আমার এক বন্ধু এর মধ্যে খবর দিল, থ্রিল খুঁজতে চাইলে *মাসুদ রানা*, *কুয়াশা* পড়া শুরু কর। ওগুলো পড়া শুরু করলাম। ১৯৯৫ বা ৯৬ সালের আগে নীলক্ষেতের কল্যাণে শ-খানেক সায়েন্স ফিকশনের ইংরেজি বই চলে এল আমার হাতে। এখন আমার কাছে বড় একটা সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিনের সংগ্রহও আছে।

বিজ্ঞানচিন্তা : দেশের প্রথম সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন *মৌলিক*-এর যাত্রা শুরু হলো কীভাবে?

হাসান খুরশীদ রুমী : ১৯৯৬-৯৭ সালের কথা। রম্য লেখক আহসান হাবীব ভাইয়ের 'দিনরাত্রি' নামে একটা প্রকাশনী ছিল। একদিন আমার বাসায় আনোয়ার সাদাত নামে একজন বুয়েটছাত্র এলেন। বললেন, 'আপনার একটা সায়েন্স ফিকশন গল্প লাগবে। কাজী আনোয়ার হোসেন বলেছেন, আপনার সায়েন্স ফিকশনের প্রতি আগ্রহ আছে।' আমার কাছে মৌলিক একটা গল্প চাইলেন। আমি তো মৌলিক গল্প লিখি না। সেবা প্রকাশনী থেকেও আমার একটা বই বেরিয়ে গেছে তত দিনে। কাজীদা আমাকে খুব আদর করতেন। আত্মীয় ছিলেন তিনি। ওনার দুই ছেলে আমাকে মামা ডাকেন। তখন আমি *কিশোর পত্রিকায়* কাজ করতাম। যা-ই হোক, আমি তাঁকে বললাম, ভাই আমি তো মৌলিক লিখি না। অ্যাডাপ্ট করে দিতে পারি। আনোয়ার সাদাত তাতেই রাজি হলেন। এরপর বই বেরোল। আমি মেলায় গেলাম। সেখানে আহসান হাবীব ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা। স্টলটা দিনরাত্রি প্রকাশনীর।

বললাম, ভাই আমার সায়েন্স ফিকশন গল্প এই বইয়ে আছে। আমি কি লেখক কপি পাব? উনি (মজা করে) বললেন, 'না। আপনাকে কিনতে হবে। মেলা শেষে এসে লেখক কপি নেবেন।' আমি সঙ্গে সঙ্গে দুই কপি কিনি। মেলার শেষ দিকে গেলে হাবীব ভাই লেখক কপি তুলে দেন আমাকে।

পরের বছর আনোয়ার সাদাত আবার এলেন। বললেন, 'আপনার আরেকটা গল্প লাগবে।' বললাম, আমার গল্প তো দেবই, সঙ্গে আরও কয়েকজনের লেখা দেব। উনি রাজি হলেন। আমি সম্ভবত একসঙ্গে চার-পাঁচটা গল্প দিয়েছিলাম। আবার বই বের হলো। মেলায় গেলাম। হাবীব ভাই আবার একই কাজ করলেন। আমি আবার দুই কপি কিনলাম। এরপর হাবীব ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি থাকেন কোথায়?' বললাম, ক্যান্টনমেন্ট। উনি বললেন, 'আপনি কি খুব সায়েন্স ফিকশন পড়েন?' বললাম, জি পড়ি। আনোয়ার সাদাত আমার বাসায় গেছেন। উনি দেখেছেন, আমার সায়েন্স ফিকশনের কালেকশন।

তারপর হাবীব ভাই বললেন, 'আপনি স্টলের ভেতরে আসেন।' এই প্রথম উনি আমাকে ভেতরে ডাকলেন। এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলেন যেন অনেক দিনের পরিচিত আমরা।

জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাবেন?' আমি দুধ-চা খাই না। কিন্তু সেদিন দুই কাপ খেয়ে ফেললাম। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে আপনি পরে দেখা করতে পারবেন? *উদ্ভাস* অফিসে আসবেন মেলার পর।' এভাবে *উদ্ভাস*-এ কিছুদিন কাজ করলাম। তারপর একদিন ডেকে বললেন, 'ভাই কিছু মনে করবেন না। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা পত্রিকা পেয়েছি। একটা সিনে পত্রিকা, নাম *মৌলিক*। ওটা নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওরা আর বের করবে না।' এখন আমি *মৌলিক* নাম ঠিক রেখে যেকোনো বিষয়ের ওপর পত্রিকা বের করতে পারি। তখনই আমার মাথায় এল, সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা বের করলে কেমন হয়। কারণ, এটা বাংলাদেশে নেই।

হাবীব ভাই একদিন আমার বাসায় এলেন। আমার সংগ্রহ দেখে তাঁর মাথা চক্কর খেয়ে গেল! বাংলাদেশে হুমায়ূন আহমেদ আর জাফর ইকবাল ছাড়া তখন কেউ সায়েন্স ফিকশন লিখতেন না তেমন। তার মানে আমরা *মৌলিক*-এ সায়েন্স ফিকশন খুব কম পাব। আমাদের অনুবাদ আর অ্যাডাপ্টশন করতে হবে। এভাবে আমার সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা *মৌলিক*-এর জগতে ঢোকা।

বিজ্ঞানচিন্তা : এখন সায়েন্স ফিকশনের অনেক কিছু বাস্তব হয়ে উঠছে। এআই বাস্তব হয়ে উঠেছে, মানুষ মঙ্গলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আপনার কি মনে হয়, এআই বা রোবট পৃথিবী দখল করে নেবে?

হাসান খুরশীদ রুমী : এআই বা রোবটের বিশ্ব জয় করার ধারণা সায়েন্স ফিকশনের একটি জনপ্রিয় বিষয়। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার পার্থক্য করা জরুরি। যদিও এআই ও রোবোটিকস দ্রুত উন্নতি করছে, এগুলো এখনো মানুষের তৈরি এবং নিয়ন্ত্রিত সরঞ্জাম। এআই ও রোবট ডিজাইন করা

হয়েছে সাহায্য করার জন্য, প্রক্রিয়াগুলোকে দাঁড় করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য। কাজে দক্ষতা বাড়ানো ছাড়া এদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। তা ছাড়া এর নৈতিক ব্যবহার নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে, এর অপব্যবহার রোধ করতে নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন তৈরি হচ্ছে। দিন শেষে সব মানুষের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হবে। মানব সম্প্রদায় নিশ্চয়ই তার নিজের অস্তিত্ব সংকটের মুখে ফেলবে না।

বিজ্ঞানচিন্তা : কলেজে পড়ার সময় আপনি কাজী আনোয়ার হোসেনের কাছে যান, সেবা প্রকাশনীতে কাজ করেন। তাঁর কথা ইতিমধ্যে একবার বলেছেন। সেখান থেকে আপনার প্রথম সায়েন্স ফিকশন প্রকাশিত হয়। সেবায় আপনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা কেমন? কীভাবে শুরু করেছিলেন?

হাসান খুরশীদ রুমী : ১৯৭৬ সালে আমি কাজীদার কাছে যাই। আমার খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে কাজীদার ভালো সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া পারিবারিক একটা সম্পর্ক ছিল আমাদের। আমি সাহস নিয়ে কাজীদার কাছে গিয়েছিলাম। বললাম, আমি অনুবাদ করতে চাই। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী অনুবাদ করবা?' আমি একটা নমুনা লেখা নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন কাঁচা হাতের লেখা আমার। দেখে বলেছিলেন, 'দুই দিন পরে এসো।' গেলাম দুদিন পর। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী করো?' বললাম, ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। বললেন, 'শোনো, তোমার ব্যাপারে আমি জানি।' আমি কিন্তু তখনো আমার পরিচয় দিইনি। অবাক হলাম, জানলেন কী করে? এই দুদিনে আমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন? মাসুদ রানাকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন মনে হয় (হা হা হা)। পরে জেনেছিলাম, আমার খালাতো ভাই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, উনি বললেন, 'তোমাকে আমি চিনি। এখন এগুলো বাদ দাও। পড়ালেখা শেষ করো। তারপর আমার সঙ্গে দেখা করো।'

কাজীদার সামনে গেলে কেন যেন ঘেমে যেতাম। একটা ভয় কাজ করত। কোনো সময় ভাবিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলব, ছবি তুলব। সেবা প্রকাশনীতে তো আমার যাওয়ার কথা ছিল না। গিয়েছি। ভাগ্য নিয়ে গেছে আমাকে।

এর পর থেকে আমি সায়েন্স ফিকশন গল্প পড়ি আর অনুবাদ করি। একদিন সেগুলো জমা দিলাম সেবায়। কাজীদা এডিট করে দিলেন। রাত জেগে জীবনের প্রথম প্রচ্ছদ বানালাম। কাজীদাকে দেখালাম, উনি পছন্দ করলেন। বললেন, 'চেষ্টা করে যাও।' সেবা থেকে আমার প্রথম বই বের হয় আমার করা প্রচ্ছদে। ১৯৯২ সালের দিকের ঘটনা এটা। এরপর আমাকে একদিন ডেকে রয়্যালটির টাকা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এরপর কী করবে?' বললাম, কিছু ভাবিনি। তখন মাসিক *কিশোর পত্রিকার* সঙ্গে নেশার মতো জড়িয়ে গেছি। প্রতিদিন সকালে বের হতাম আর দুপুরে ফিরতাম। *কিশোর পত্রিকার* জন্য তখন লিখছি, কাজ করছি, কমিকস অনুবাদ করছি। লেখক সুমন্ত আসলাম তখন *কিশোর পত্রিকায়* এসে লেখা দিয়ে চলে যেতেন। একদিন কাজী শাহনূর হোসেন আমাকে একটা বইয়ের প্রচ্ছদ করতে বলল। রাত জেগে প্রচ্ছদ করে কাজীদাকে দেখালাম। মাঝেমধ্যে উনি কিছু ঠিক করে দিতেন। আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব বুঝিয়ে, শিখিয়ে দিতেন। তখন আমি *কিশোর পত্রিকার* পাশাপাশি পুরোদমে প্রচ্ছদ করে যাচ্ছি। কখনো কখনো কাজীদা প্রচ্ছদ দেখে বলতেন, 'বুলস আই'; কখনো বলতেন, 'স্বপ্ন তুলে এনেছ।'

বিজ্ঞানচিন্তা : 'উন্মাদ' বাংলাদেশের যেকোনো ম্যাগাজিন থেকে একটু ভিন্নধর্মী। এখানে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

হাসান খুরশীদ রুমী : আমার অভিজ্ঞতা মজার। কারণ, হাবীব ভাই অনেক মজার মানুষ। আমাদের দুজনের কাছে দুটি চাবি থাকত। যে আগে যেত, সে গিয়ে অফিস খুলত। *উন্মাদ*-এ

> আমি সাহস নিয়ে কাজীদার কাছে গিয়েছিলাম। বললাম, আমি অনুবাদ করতে চাই। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী অনুবাদ করবা?' আমি একটা নমুনা লেখা নিয়ে গিয়েছিলাম

থাকতেই *মৌলিক* ম্যাগাজিন বের করতাম আমরা। টাকার অভাবে বন্ধ হওয়ার পর আমি আর কী করব! তখন হাবীব ভাই বললেন *উন্মাদ*-এ কাজ করতে। কিন্তু আমি ওখানে কী করব? হাবীব ভাই বললেন বিদেশি হাসির গল্প অনুবাদ করতে। একদিন হাবীব ভাইকে বললাম, ভাই আমি আর এভাবে লিখতে পারব না। ওদের উইটটা (রসিকতা বোধ) আমি ঠিক ধরতে পারছি না। তখন অন্য একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। পরে আমি কোলাজ ওয়েস্টার্ন কমিকস নিয়ে কাজ করেছি টানা দুই বছর। কোলাজ ওয়েস্টার্ন নিয়ে পরে একটা সংকলনও করেছে *উন্মাদ*।

বিজ্ঞানচিন্তা : হুমায়ূন আহমেদের একটা সায়েন্স ফিকশন গল্পের বইয়ের সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন। আপনাকে সেই বই উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। এত বড় একজন লেখকের সঙ্গে কাজ করতে কেমন লেগেছে?

হাসান খুরশীদ রুমী : সে সময় হাবীব ভাইয়ের সঙ্গে আমার ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে ছিল না। একদিন *উন্মাদ* অফিসে গিয়ে শুনলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের পা কেটে গিয়ে সম্ভবত ঘা হয়ে গেছে। হুমায়ূন ভাই হাবীব ভাইকে বললেন, তাঁর জন্য কোনো ডাক্তার থাকলে পাঠিয়ে দিতে। তখন *উন্মাদ*-এর ডা. কল্লোল (মিজানুর রহমান কল্লোল) বসা ছিল। *উন্মাদ*-এ আবার ডাক্তারের অভাব ছিল না। ডা. কল্লোল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবেন নাকি?' গেলাম ওর সঙ্গে। অবসর থেকে বের হওয়া *সায়েন্স ফিকশন অমনিবাস* আমার সঙ্গে ছিল। ডা. কল্লোল তাঁকে দেখে ওষুধ দিয়ে আসার সময় হুমায়ূন ভাইকে বইটা দিয়ে চলে এলাম। পাঁচ বছর পর প্রগতি পাবলিশার্সের কর্মকর্তা আবরার মাসুদ হুমায়ূন ভাইয়ের *সূর্যের দিন* থেকে কমিকস বের করতে চাইলেন। হুমায়ূন ভাইয়ের অনুমতিতে হাবীব ভাই আঁকলেন।

ফাইনালি তাঁকে দেখানোর জন্য যাওয়ার সময় আমি গেলাম সঙ্গে। আমার সঙ্গে তখন হুমায়ূন আহমেদের ছয়টা সায়েন্স ফিকশন আর ফ্যান্টাসি গল্পের ফটোকপি ছিল। আমি ব্যাগ থেকে ওগুলো বের করার জন্য চেইন খুলতে যাব, এর মধ্যে হুমায়ূন ভাইয়ের বডিগার্ড পিস্তল বের করে ফেলল! দেখি, আমার দিকেই ধরা। তখন হুমায়ূন ভাই তাকে ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেন। আমি ফটোকপি দেখাই। তাঁকে জানাই যে এই গল্পগুলো দিয়ে একটা সায়েন্স ফিকশন বই বের করলে ভালো হয়। সঙ্গে হয়তো আরও ছয়টা লিখতে হবে। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো সব কি সায়েন্স ফিকশন গল্প?' বললাম, না, তিনটা সায়েন্স ফিকশন আর তিনটা ফ্যান্টাসি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নিজের পাবলিকেশন আছে?'

বললাম, না। উনি বললেন, 'তোমার পাবলিকেশন থাকলে এই বইটা তোমাকে দিতাম। কারণ, আমাকে কেউ কোনো দিন এমন কথা বলেনি।' তখন আমার পাশে আবরার মাসুদ বসা, আমি তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আসার সময় বলে এলাম, আপনার এই বইয়ের প্রথম ক্রেতা কিন্তু আমি হব।

এরপর তিন দিন পর আমার টিঅ্যান্ডটি নম্বরে একটা কল এল। কল ধরার পর থেকে আমি একবার বসি, আর একবার দাঁড়াই। ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভালো আছ?' বললাম, জি ভাই। আপনি ভালো আছেন? বললেন, 'তুমি তো আমাকে ভালো থাকতে দিচ্ছ না। আমি তো তিনটা গল্প লিখে ফেলেছি। তুমি একটা প্রচ্ছদ বানিয়ে দাও। প্রচ্ছদ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো।' আমি বলেছিলাম, আমি তো আঁকতে পারি না। বললেন, 'তোমার বইয়ের প্রচ্ছদ তুমি যেভাবে, অর্থাৎ কোলাজ করবে।'

যাহোক, আমি এক বসায় ১৪টা প্রচ্ছদ করেছিলাম। তিন দিন পর সব কটি প্রচ্ছদ সিডিতে নিয়ে ওনাকে ফোন দিলাম। আমার ফোন পেয়ে তিনি আবার অনেককে ফোন দিয়েছেন এই প্রচ্ছদ দেখানোর জন্য। খুব এক্সাইটেড ছিলেন। প্রকৃতি লেখক মোকারম হোসেনকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। একটার পর একটা দেখে গেলেন। তারপর সেখান থেকে একটা বাছাই করলেন। বইয়ের নাম দিলেন, *অঁইক সায়েন্স ফিকশন গল্পমালা*। পরে আবার নাম পরিবর্তন করেছেন। শুধু অঁইক।

দুই দিন পর হুমায়ূন ভাই আমাকে ফোন করলেন। বললেন, 'আমার বসায় আসো। তোমার নামের বানান ঠিক করতে হবে।' ওনার বাসায় গিয়ে দেখি, আমাকে বই উৎসর্গ করছেন। আমি তো অবাক। কারণ, চার দিনের পরিচয় আমাদের। এরপর বই বের হলে ওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাভারের টাকা নিয়েছ?' বললাম, না। উনি একটা ড্রয়ার খুলে টাকা বের করে হাতে যা আসে, দিয়ে দিলেন। নিতে চাচ্ছিলাম না। বললাম, এই প্রচ্ছদ আমি আপনাকে গিফট করেছি।

বিজ্ঞানচিন্তা : হুমায়ূন আহমেদ ও মুহম্মদ জাফর ইকবাল, দুজনই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখক। আপনার মতে, দুজনের মধ্যে কে সেরা?

হাসান খুরশীদ রুমী : হুমায়ূন আহমেদ। কারণ, উনি সফটকোর সায়েন্স ফিকশন লেখেন। আর মুহম্মদ জাফর ইকবাল হার্ডকোর সায়েন্স ফিকশন লেখেন, ওনার বেশির ভাগ কাজ মহাকাশ নিয়ে।

বিজ্ঞানচিন্তা : বাংলাদেশে মৌলিক বিজ্ঞান কল্পকাহিনি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? আমরা কি বিশ্বমানের সাই-ফাই লিখতে পারছি?

হাসান খুরশীদ রুমী : আগের তুলনায় অনেক এগিয়েছে। আমরা যখন *মৌলিক* বের করেছিলাম, তখনকার তুলনায় অনেকটা এগিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বিশ্বমানের সায়েন্স ফিকশন না লিখতে পারলেও কাছাকাছি হচ্ছে। সায়েন্স ফিকশনের মতো আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। অবশ্যই আমরা একদিন বিশ্বমানের সায়েন্স ফিকশন লিখতে পারব। আমাদের নিজেদের মেধা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানচিন্তা : বর্তমানে ভালো মৌলিক সায়েন্স ফিকশন কারা লিখছেন বলে মনে করেন?

হাসান খুরশীদ রুমী : অনেকেই লিখছেন। তাঁদের মধ্যে দীপেন ভট্টাচার্য আছেন, শিবব্রত বর্মন, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, তানজিনা হোসেন, মুস্তফা তানিম, মাশুদুল হক, তানজিম রহমানসহ অনেকেই আছেন।

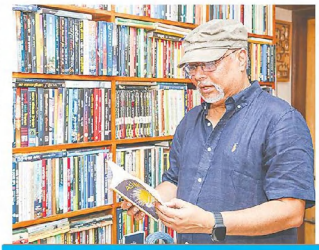

একনজরে

জন্ম : ২ নভেম্বর, ১৯৫৯
বাবা-মা : খোরশেদ উদ্দীন আহমেদ, রাবেয়া খাতুন
পরিবার : স্ত্রী সানজীদা আবেদীন এবং এক মেয়ে ও এক ছেলে
প্রিয় বই : *অ্যাফিবিয়ান ম্যান* (আলেক্সান্ডর বেলায়েভ)
প্রিয় লেখক : হুমায়ূন আহমেদ, আইজ্যাক আজিমভ, আর্থার সি ক্লার্কসহ অনেকে
প্রিয় মুভি : *ডুন, ইনসেপশন, ২০০১ এ স্পেস ওডেসি, দ্য ফেবুলাস ব্যারন মুলশাউজেন*
অবসর : বই পড়া, লেখালেখি, ইন্সট্রমেন্টাল মিউজিক শোনা

বিজ্ঞানচিন্তা : আমাদের ধারণা, একটা দেশের সায়েন্স ফিকশনের মান দেখে বোঝা যায়, সে দেশের বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কোন পর্যায়ে রয়েছে। আপনি কী মনে করেন, সায়েন্স ফিকশন ও বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির আদৌ কি কোনো সম্পর্ক আছে?

হাসান খুরশীদ রুমী : সায়েন্স ফিকশন এবং দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা হলেও আছে। বিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশনের চর্চা যেখানে বেশি হবে, সেখানে বিজ্ঞান নিয়ে কল্পনার পরিধিও বিস্তৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানচিন্তা : কোনো বই পড়ে কি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল?

হাসান খুরশীদ রুমী : ফাউন্ডেশন সিরিজ আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে দারুণভাবে। মানবজাতির ভবিষ্যতের এক মহাকাব্য বলা যায় এটাকে। সিরিজের বিভিন্ন বই এখনো মাঝেমধ্যে পড়ি সময় পেলে। পড়তে গিয়ে মনে আশা হয়, আমরা হয়তো টিকেই যাব এই মহাবিশ্বে। হয়তো নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার যে ভয়ানক আশঙ্কা করেন ভবিষ্যৎ বক্তারা, সেটাকে হয়তো আমরা পার করে একটা মাল্টিসোলার কিংবা কে জানে, হয়তো গ্যালাকটিক সভ্যতা গড়ে তুলতে পারব।

বিজ্ঞানচিন্তা : বিজ্ঞানচিন্তার বেশির ভাগ পাঠক কিশোর ও তরুণ। তাদের উদ্দেশে কী বলবেন?

হাসান খুরশীদ রুমী : বিজ্ঞানচিন্তার পাঠকদের জন্য একটাই কথা, পড়ো, পড়ো, পড়ো। আশপাশে যা পাবে পড়ে ফেলো। তারপর ভালোটা গ্রহণ করো, খারাপটা ছুড়ে ফেলে দাও। দিন শেষে একজন মানবিক বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে ওঠো।

অনুলিখন : **অনিক রয়**, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

জৈব যৌগের গঠন কীভাবে আঁকবে

রউফুল আলম

জৈব যৌগের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। যেসব রাসায়নিক অণু বা যৌগ কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত, সেগুলোকেই আমরা সাধারণভাবে জৈব যৌগ বা অর্গানিক মলিকিউল (Organic Molecule) বলি। কখনো কখনো এগুলোকে হাইড্রোকার্বনও বলা হয়, যেহেতু এগুলোতে হাইড্রোজেন ও কার্বন পরমাণু থাকে।

সব সময় যে শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেনই থাকে, তা নয়। এই দুটি পরমাণুর পরিমাণ বা আনুপাতিক সংখ্যা বেশি থাকে। তবে অন্যান্য কিছু পরমাণু, যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদিও থাকতে পারে।

জৈব যৌগ নামটির কারণ হলো জীবের যৌগ বা জীবনের যৌগ বা প্রাণের যৌগ। অর্থাৎ যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই জৈব যৌগ আছে। উদ্ভিদে, প্রাণীতে, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসে মূলত জৈব যৌগই বেশি। মানুষের শরীরে অসংখ্য জৈব যৌগ প্রতিদিন ভাঙে এবং গড়ে। এই ভাঙা-গড়ার বিষয়টাকে বলা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reaction)। আর রাসায়নিক বিক্রিয়াকে লিখে প্রকাশ ও বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure) এবং অন্যান্য চিহ্ন। তাহলে, রাসায়নিক সংকেত (Chemical Formula) ও রাসায়নিক গঠনের মূল পার্থক্যটা কী?

মূল পার্থক্য হলো, সংকেত শুধু বলে দেয় কোন কোন পরমাণু আছে, কতসংখ্যক আছে। কিন্তু রাসায়নিক গঠন বলে দেয় অণুতে পরমাণুগুলো কীভাবে বিন্যস্ত। কীভাবে একটা পরমাণুর সঙ্গে অন্য পরমাণু যুক্ত। রাসায়নিক গঠন অণু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার ও অনুধাবন করার সুযোগ দেয়। একটা উদাহরণ দিই।

তোমরা তো সবাই কমবেশি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করো। অনেক হ্যান্ড স্যানিটাইজারে একটা জৈব যৌগ ব্যবহার করা হয়। এর নাম আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল। একে ২-প্রোপানলও বলা হয়। এই যৌগের রাসায়নিক সংকেত হলো C_3H_8O। অর্থাৎ অণুটিতে তিনটি কার্বন, আটটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। যৌগটির গঠন নিম্নরূপ :

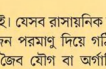

ছবি ১: আইসোপ্রোপাইল অণু

রাসায়নিক গঠন থেকে প্রথমেই আমরা বুঝতে পারছি, অক্সিজেন পরমাণুটি কার সঙ্গে যুক্ত আছে। সেটি যুক্ত আছে একটি কার্বন এবং একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে। আরও জানতে পারছি, অক্সিজেন পরমাণুটি মাঝের কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। যদি মাঝের কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পার্শ্ববর্তী কার্বনের সঙ্গে যুক্ত থাকত, তাহলে কিন্তু সেটা আর আইসোপ্রোপানল হতো না। অন্য অণু হয়ে যেত। তাহলে বুঝতে পারলাম, রাসায়নিক গঠন থেকে আমরা কী করে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারি। ফলে রাসায়নিক গঠন আঁকারও কিছু নিয়ম আছে।

জৈব যৌগের গঠন এঁকে প্রকাশের চেষ্টা শুরু হয় প্রায় ২০০ বছর আগে থেকে। তারপর কালের ধারাবাহিকতায়, বর্তমান সময়ে এসে, জৈব যৌগকে অনেক আধুনিক রূপে এঁকে প্রকাশ করা হয়। অণুদের যদিও আমরা খালি চোখে দেখি না, কিন্তু অসংখ্য অণুর গঠন আমরা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করেছি বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, অণুদের নিয়ে গবেষণা করে।

জৈব যৌগ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, গবেষণা করেন, তাঁদের বলা হয় অর্গানিক কেমিস্ট। জৈব রসায়নবিদ। তাঁরা জৈব যৌগ আঁকার বিষয়ে খুব পারদর্শী। এই পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় শিখে ও চর্চা করে। কারণ, ভুল অঙ্কন করলে সবার কাছে সেটা সহজে বোধগম্য হয় না। তাই সারা দুনিয়ার অর্গানিক কেমিস্টরা জৈব যৌগ আঁকার জন্য কিছু নিয়ম অনুসরণ করেন। এটা একটা ভাষা। কারণ, একটা বিক্রিয়া সঠিকভাবে আঁকতে পারলে বহু শব্দ বলা হয়ে যায়। আলাদা করে ব্যাখ্যা করতে হয় না। রাসায়নিক গঠন হাতে আঁকা ছাড়াও বর্তমানে অনেক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। যেমন কেমড্র (ChemDraw)। সারা পৃথিবীর অর্গানিক কেমিস্টদের মধ্যে খুব প্রচলিত একটা সফটওয়্যার এটা। এই লেখার অঙ্কনের জন্য আমি সেটিই ব্যবহার করেছি। তবে অর্গানিক কেমিস্টরা হাতেও অঙ্কন করে শেখেন এবং অভ্যস্ত।

আজ আলোচনা করব জৈব যৌগ অঙ্কনের কিছু নিয়ম নিয়ে। বাংলাদেশে উচ্চতর পর্যায়েও অনেকে জৈব যৌগ আঁকার সঠিক নিয়ম অনুসরণ করেন না। আন্তর্জাতিকভাবে কীভাবে জৈব যৌগ অঙ্কন করা হয়, তা তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে হলো। এই চর্চা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করলে উপকৃত হবে। শিক্ষকেরা যদি এভাবে চর্চা করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা সময়মতো সঠিক ও বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়টা শিখতে পারবে।

লেখাটা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা পর্বে লেখা হবে। প্রথমে অঙ্কন এবং পরে জৈব যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়েও সহজভাবে লেখা হবে।

আমরা যখন মিথেন (ম্যাথেইনও বলা হয়) অণুর সংকেত লিখি, তখন শুধু CH_4 লিখি। একটা কার্বন পরমাণুর সঙ্গে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত। কিন্তু এটাকে যদি আরও একটু গভীরভাবে বোঝার জন্য আঁকি, তখন আঁকা হয় নিচের ছবির মতো (ছবি ২)। এভাবে এঁকে শুধু অণুটির সংকেতই বোঝানো হয় না; বরং এর জ্যামিতিক গঠন সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়। মিথেন অণু যে চতুস্তলকীয় (Tetrahedral), সেটা বোঝানো হয়। অণুদের এই নির্দিষ্ট গঠন এদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনেক কিছু নির্ধারণ করে। এখন যদি ইথেন অণুকে লিখে প্রকাশ করা হয়, তাহলে লেখা যাবে C_2H_6 অথবা CH_3-CH_3। তবে অর্গানিক কেমিস্টরা আরও স্বল্প সময়ে এঁকে প্রকাশের জন্য সেটাকে ভিন্নভাবেও প্রকাশ করেন। আসলে অর্গানিক কেমিস্টরা সময়কে অনেক গুরুত্ব দেন।

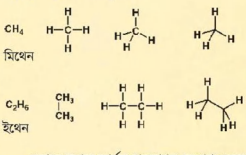

ছবি ২: মিথেন ও ইথেন অণুর গঠনের বিভিন্ন রূপ

এভাবে যখন কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বেড়ে যায়, তাখন প্রতিটি কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন দেখিয়ে রাসায়নিক গঠন লিখতে বা আঁকতে গেলে অনেক সময় লেগে যায়। আবার প্রচলিত নিয়মে অণুকে যেভাবে সরলরৈখিকভাবে দেখানো হয়, বাস্তবে অণুরা সে রকম সরলরৈখিক হয় না।

যেমন প্রোপেইন অণুতে তিনটি কার্বন পরমাণু আছে (ছবি ৩)। বিভিন্নভাবে এর রাসায়নিক গঠন প্রকাশ করা যায়। তবে আধুনিক নিয়মে, শুধু দুটি ছোট সরলরেখা যুক্ত করেই প্রোপেইন অণু বোঝানো হয়। রেখা দুটি যুক্ত করলে একটা কোণ তৈরি হয়, যেটা ১২০ ডিগ্রির মতো করে আঁকা। সে কোণের কার্বন পরমাণুটি হলো ম্যাথেলিন গ্রুপ (CH_2) আর প্রান্তিক দুটি অংশ হলো ম্যাথাইল বা মিথাইল গ্রুপ (CH_3)। এভাবে আঁকতে সহজ। সময় কম লাগে এবং ত্রিমাত্রিক

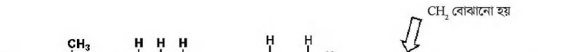

অণুরা বাস্তবে এমন সরলরৈখিক হয় না। প্রচলিত অঙ্কন, তবে অনাধুনিক

অণুদের ত্রিমাত্রিক গঠন। এভাবে এঁকে প্রকাশ করলে বেশি সঠিক হয়।

অর্গানিক কেমিস্ট্রা আরও সাধারণভাবে এভাবেই আঁকেন

ছবি ৩ : প্রোপেইন অণুর গঠনের বিভিন্ন রূপ (সর্বভানে আধুনিক নিয়ম)

গঠনও অনেকটা তুলে ধরা যায়। এখানে বিউটেইন, পেন্টেইন, হেক্সেইন অণুর উদাহরণ দেওয়া হলো (ছবি ৪)। শিক্ষার্থীরা এভাবে অন্য অণুগুলোও এঁকে চর্চা করতে পারো।

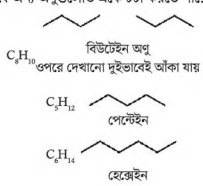

ছবি ৪ : এভাবে অনেক বড় বড় অণু দ্রুত আঁকা যায়

ওপরের অণুগুলোকে বলা হয় সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। সম্পৃক্ত বলতে কী বোঝানো হয়? কোনো জৈব যৌগে যখন সব কটি কার্বন পরমাণু একক বন্ধনে যুক্ত থাকে, সে যৌগকে বলা হয় সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।

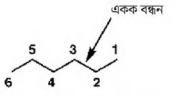

ছবি ৫ : হেক্সেইন অণু

এখন আমরা কার্বন পরমাণু গণনার চর্চা করব এবং হেক্সেইন অণুর উদাহরণ ব্যবহার করছি। ওপরে হেক্সেইন অণুর গঠন আঁকার পর গণনা করলে ছয়টি কার্বন পরমাণু পাব। চারটি কার্বন পরমাণু হলো অভ্যন্তরীণ (Internal; ২-৫) এবং দুটি কার্বন পরমাণু হলো প্রান্তিক (Terminal; ১ এবং ৬)। প্রান্তিক কার্বনগুলো হলো ম্যাথাইল বা মিথাইল গ্রুপ (CH_3) এবং অভ্যন্তরীণ কার্বন পরমাণুগুলো ম্যাথিলিন গ্রুপ (CH_2)।

ওপরে যেসব অণুর উদাহরণ দিয়েছি, সেগুলো সবই সরলরৈখিক বা লিনিয়ার অণু। এগুলোকে অচক্রিক বা acyclic অণুও বলা হয়। তার মানে চক্রিক বা cyclic অণুও আছে। সাইক্লোহেক্সেইন যেমন অচক্রিক হয়, তেমনি চক্রিকও হয়। তবে দুটো অণু কিন্তু এক না। আলাদা আলাদা গঠন।

নিচের অণুটি হলো সাইক্লোহেক্সেইন। নামের সঙ্গেই সাইক্লো যুক্ত করে চক্রিক বোঝানো হয়েছে।

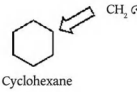

ছবি ৬ : সাইক্লোহেক্সেইনে ছয়টি কোণ আছে। প্রতিটি কোণ মূলত একেকটি CH_2 বা ম্যাথিলিন গ্রুপকে বোঝায়। সুতরাং সাইক্লোহেক্সেইনের সংকেত C_6H_{12}।

সাইক্লোহেক্সেইনে কি কোনো মিথাইল গ্রুপ আছে? একটু চিন্তা করে দেখো। সাইক্লোহেক্সেইনের ত্রিমাত্রিক গঠনও আমরা জেনেছি। সাইক্লোহেক্সেইন মূলত চেয়ারের মতো গঠনে থাকে। অর্থাৎ এই গঠনে সবচেয়ে স্থিতিশীল বা স্টেবল। তাই এটাকে বলা হয় চেয়ার কনফরমেশন (Chair Conformation)। চেয়ার কনফরমেশন নিয়ে এখনই বিস্তর আলোচনা করব না। কারণ, পরে এ বিষয়টা আবারও আলোচনায় আসবে।

কয়েকটা অণু এঁকে এভাবে চর্চা করলেই পুরো বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। মনে রাখতে সমস্যা হবে না। রাসায়নিক গঠনের আধুনিক অঙ্কন আমরা শিখে গেলে অনেক কিছু বুঝতে এবং বোঝাতে সহজ হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝতেও অনেক সহজ হবে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী রাসায়নিক বিক্রিয়া বোঝে না বা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়, তার একটা কারণ কিন্তু রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে ভালোভাবে না জানা। পরের পর্বে আরও কিছু চমৎকার বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

লেখক : গবেষক ও লেখক

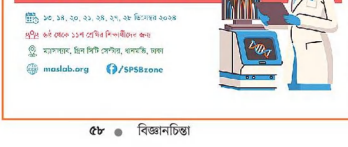

চলছে স্কুল অব বায়োইনফরমেটিক্স

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের সামনে বায়োইনফরমেটিকস ও জিনোমিকসের বিস্ময়কর দুনিয়া মেলে ধরতে আয়োজিত হচ্ছে স্কুল অব বায়োইনফরমেটিক্স। চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ধানমন্ডির মাকসুদুল আলম বিজ্ঞানাগারে এটি আয়োজিত হবে। ডিএনএ সিকোয়েন্সিং, সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট ও জেনেটিক ডেটা বিশ্লেষণের মোট ১৪টি সেশন হবে এ ক্যাম্পে। জুনিয়র (ষষ্ঠ-অষ্টম) ও সিনিয়র (নবম-একাদশ) ক্যাটাগরিতে মোট ২৫ শিক্ষার্থী নেওয়া হবে এ কর্মশালায়। ক্যাম্প শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রজেক্ট তৈরি করবে এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে তা উপস্থাপন করবে।

বিজ্ঞানাকাশে সাত নক্ষত্র

বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস বহুদিনের। এককালে ইউরোপ-আমেরিকার বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত উপমহাদেশে বাঙালি বিজ্ঞানীরা ইতিহাস বদলে দেওয়ার মতো গবেষণা করেছেন। সেই বিজ্ঞানীদের অনেকেই আজ আমাদের স্মৃতিতে নেই। যে জাতি ইতিহাস ভুলে যায়, শিকড় ভুলে যায়, এগিয়ে যাওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সম্ভবত সে কারণেই আজ অনেকে ভাবেন, দেশে বসে ভালো বা বিশ্বমানের গবেষণা করা যায় না। যাঁরা গবেষণায় আগ্রহী, বিজ্ঞানে আগ্রহী, বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস জানতে চান; শুধু দেশ বা ভাষার সীমানায় নয়, বরং বিশ্বমানের কিছু গবেষকের বিজ্ঞানচর্চা ও জীবনের পথপরিক্রমা জানতে-বুঝতে চান, তাঁদের জন্যই প্রদীপ দেব লিখেছেন *সপ্তর্ষি : সাতজন বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী*। 'সপ্তর্ষি' কথাটার অর্থ সাত ঋষি—বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার জগতে এই বিজ্ঞানীদের ঋষি বা পথপ্রদর্শক বলা যায় নিঃসন্দেহে। আর নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম থেকে বলা যায়, তাঁরা আমাদের বিজ্ঞানাকাশের তারা।

কারা এই সাতজন? তাঁদের কেউ কেউ আমাদের চেনা বটে, তবে কেউ কেউ আজও রয়েছেন একদম আড়ালে।

চেনাদের দিয়েই বইটি শুরু। একদম শুরুতেই এসেছে জগদীশচন্দ্র বসুর কথা। এই বাঙালি বিজ্ঞানী তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদানে আগ্রহী ছিলেন গবেষণাজীবনের শুরুর দিকে। ইতিহাসে প্রথম কৃত্রিম মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ তৈরি করেছেন তিনি, ১৮৯৫ সালে, মার্কনিরও আগে। পরের দিকে উদ্ভিদের অনুভূতি তাঁকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। এ নিয়ে তাঁর গবেষণা কিংবদন্তিতুল্য। তবে জগদীশচন্দ্র বাঙালির অদম্য চেতনার আদর্শ উদাহরণ। তিন বছর বিনা বেতনে পড়িয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, প্রতিবাদস্বরূপ এক পয়সাও নেননি, নিজের হাতে দেশি কাঁচামাল দিয়ে বানিয়েছেন বিশ্বমানের গবেষণাগার।

একই রকম অদম্য আরেক বাঙালি বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসু। অতটা পরিচিত নন তিনি আজ আর, অথচ সেকালে

সপ্তর্ষি : সাতজন বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী
প্রদীপ দেব

প্রকাশক : বাতিঘর
প্রথম প্রকাশ : ২০২৪
প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ
পৃষ্ঠা : ২২৪
দাম : ৫০০ টাকা

মহাজাগতিক রশ্মি, পারমাণবিক ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা গবেষণায় তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ফটোগ্রাফিক ইমালশন পদ্ধতিতে মেসন কণার ভর নির্ণয় করেন তিনি। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে একই কাজ করে ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ সিসিল পাওয়েল।

এ রকম জানা-অজানা সাত ঋষির তালিকায় একে একে এসেছে বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্র, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অমলকুমার রায়চৌধুরী ও জামাল নজরুল ইসলামের কথা। এই বিজ্ঞানীদের জীবনের গল্পই শুধু নয়, তাঁদের গবেষণাকাজ নিয়েও বইটিতে প্রাথমিক ধারণা পাবেন পাঠক। 'প্রাথমিক ধারণা'; কারণ, ২২৪ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে এই সাত বিজ্ঞানীর গোটা জীবন ও কাজের বিস্তারিত তুলে আনা সম্ভব নয়। সেটি এ বইয়ের উদ্দেশ্যও নয়, তা স্পষ্ট; মেঘনাদ সাহা বা জামাল নজরুল ইসলামের জীবনালেখ্যে যেমন গবেষণার বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি। সত্যি বলতে, এই বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকের শুধু গবেষণা নিয়েই রচিত হতে পারে টাউস সাইজের বই। সম্ভবত পাঠককে এই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। সে হিসেবে বইটি সার্থক।

এই অমর বিজ্ঞানী ও বাঙালির নায়কদের জানতে-বুঝতে আগ্রহী পাঠকদের জন্যই বইটি। লেখক নিজে গবেষক, তাই সহজ ভাষায় তুলে এনেছেন কঠিন সব বিষয়ও। সবার পাঠের উপযোগী এ বই পাওয়া যাবে অনলাইন ও অফলাইন বিভিন্ন বইয়ের দোকানে।

গ্রন্থনা : মুনিয়া মানতাসা

নতুন বই

ঝটপট গণিত
কাজী আকাশ
প্রকাশক : প্রথমা
পৃষ্ঠা : ১৪৪
দাম : ৩০০ টাকা
অনেকে মুখে মুখে বড় বড় গুণ-ভাগ করে তাক লাগিয়ে দেন। এ বই পড়ে আপনিও হতে পারবেন সে রকম গণিতের জাদুকর।

ক্যারেক্টার অব ফিজিক্যাল ল
রিচার্ড ফাইনম্যান
অনুবাদ : উচ্ছ্বাস তৌসিফ
প্রকাশক : প্রথমা
পৃষ্ঠা : ২১৬
দাম : ৪৫০ টাকা
প্রকৃতি কোন ভাষায় কথা বলে। সহজ ভাষায় সেই ভাষাটির ভেতরের কথা উঠে এসেছে এ বইয়ে।

বিফোর দ্য বিগ ব্যাং
জিয়ান ফ্রান্সেসকো গুইডিচ
প্রকাশক : স্প্রিঙ্গার
পৃষ্ঠা : ২১৬
দাম : ২৩ ডলার
আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান জানাশোনা, বিগ ব্যাং থেকে কসমোলজি—তাত্ত্বিক পদার্থবিদের ভাষ্যে।

আনকভারিং ডাইনোসর বিহেভিয়ার
ডেভিড হোন
প্রকাশক : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস
পৃষ্ঠা : ২৪৮
দাম : ২৫.৯৫ ডলার
ডাইনোসরের ইতিহাস মাটি খুঁড়ে বের করে আনার রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার গল্প।

পরমাণু খুঁড়তে গিয়ে

আবুল বাসার

পরমাণুর গহিনে উঁকি দিয়ে বিজ্ঞানীরা হিমশিম খেয়ে গেলেন। এ সময় এগিয়ে এলেন এক জাপানি যুবক। বাতলে দিলেন নিজস্ব এক সমাধান। অখ্যাত এই যুবককে উটকো বলে অবজ্ঞা করলেন বেশির ভাগ বিজ্ঞানী। কিন্তু সেই যুবকের কথা ফেলা গেল না। হিদেকি ইউকাওয়া নামের সেই যুবকের নাম আজ পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা...

যুবকটির নাম হিদেকি ওগাওয়া। এক অজ্ঞাত, অখ্যাত জাপানি যুবক। বয়স ২৮ বছর। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে মাত্রই কর্মজীবন শুরু করেছেন। তখনো পিএইচডি শেষ হয়নি। তবু ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর লেখা প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ। পদার্থবিদেরা সে সময় একটা সমস্যা নিয়ে ভীষণ হিমশিম খাচ্ছেন। সেই সমস্যার দারুণ এক সমাধান রয়েছে হিদেকির ওই প্রবন্ধে। কিন্তু কে এই হিদেকি? কী ছিল তাঁর লেখা প্রবন্ধে?

ইউরোপের অভিজাত ও ডাকসাইটে বিজ্ঞানীদের সামনে তাঁকে উটকোই বলা চলে। উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছেন যেন। তাঁর কাছে পাওয়া সমাধানটা চমকপ্রদ হলেও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা কিন্তু তেমন পাত্তা দিলেন না। তবে সমাধানের তথ্যপ্রমাণের জোরটা ক্রমেই এত বেশি হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতে বাধ্য হন পদার্থবিদেরা। কী ছিল সেই সমাধান?

সেটি বুঝতে হলে ফিরতে হবে একটু পেছনে। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে পরমাণুর আরও সূক্ষ্ম ও কার্যকর মডেল প্রণয়ন করেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের অগ্রদূতেরা। এই মডেলে বলা হলো, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে ধনাত্মক প্রোটন এবং চার্জহীন নিউট্রন কণা। আর তাদের কেন্দ্র করে ঘুরছে ইলেকট্রন। তবে এই ইলেকট্রন কোয়ান্টায়িত। অর্থাৎ এদের ভৌত মান যা, তা নয়; বরং হতে পারবে শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানের। বিজ্ঞানীরা একমত যে মহাবিশ্বের সব পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক বা ইট হলো প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন। অর্থাৎ এরা লেগোর টুকরার মতো। পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন সজ্জায় টুকরাগুলো জোড়া লেগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বা বস্তু গড়ে তোলে এসব কণা।

কিন্তু এখানে তখনো ছোট্ট একটা গোঁজামিল ছিল। প্রোটন ধনাত্মক কণা। চুম্বকের মতোই বৈদ্যুতিকভাবে চার্জিত কণাগুলো একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করে। তাই একটা প্রোটন আরেকটা প্রোটনকে বিকর্ষণ করে। একইভাবে একটা ইলেকট্রন বিকর্ষণ করে আরেকটাকে। তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেকগুলো প্রোটন একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকে কীভাবে? সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে সেটা অসম্ভব। সবচেয়ে বড় সমস্যাটা বাধল নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসা বিটা রেডিয়েশন নিয়ে। তত দিনে জানা গেছে, এর মাধ্যমে একটা নিউট্রন ক্ষয় হয়ে একটা প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এটি তখনো বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যময়। কারণ, এ ঘটনা সুস্পষ্ট পদার্থবিজ্ঞানের এক মৌলিক নিয়মের লঙ্ঘন। সেটি শক্তির সংরক্ষণশীলতা বা নিত্যতা নামে পরিচিত।

ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। এ প্রক্রিয়ায় অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস ক্ষয় হয়ে হালকা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। আর বেরিয়ে আসে ইলেকট্রনের একটা স্রোত। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ ব্যবহার করে খুব সহজেই বিটা রেডিয়েশন (বা ক্ষয়) প্রক্রিয়ায় অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের মোট শক্তি এবং সেটা ক্ষয় হওয়ার পর রূপান্তরিত হালকা নিউক্লিয়াসের শক্তি নির্ণয় করা যায়। তাতে একটা গরমিল রয়ে যায়। শক্তির সংরক্ষণশীলতা অনুসারে, এই দুই নিউক্লিয়াসের শক্তির পার্থক্য হওয়া উচিত বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের মোট শক্তির সমান। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। দেখা গেল, বিটা রেডিয়েশন প্রক্রিয়ায় শুরুর নিউক্লিয়াস ও পরের নিউক্লিয়াসের শক্তির পার্থক্য বেরিয়ে

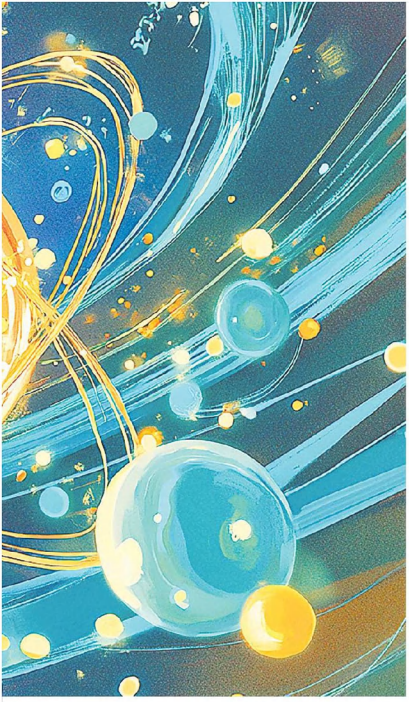

আসা ইলেকট্রনের মোট শক্তির সমান হচ্ছে না। তার মানে কি শক্তির সংরক্ষণশীলতা লঙ্ঘিত হচ্ছে? পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য ব্যাপারটা ভয়াবহ। কারণ, পদার্থবিজ্ঞান এত দিন যে মৌলিক ভিতের ওপর বেড়ে উঠেছে, এর মাধ্যমে সেই ভিতটাই তো নড়বড়ে হয়ে যায়। তাতে তো আর পায়ের নিচে মাটি থাকে না!

না, শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদদের সাধের ভিতটা টিকে গেল। সেটা টিকিয়ে রাখতে দুঃসাহসী এক প্রস্তাব দিলেন ইতালিয়ান বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি। অবশ্য প্রস্তাবটা প্রথম দিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ উলফগ্যাং পাউলি। তবে তখনো নিউট্রন কণা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বিটা রেডিয়েশন-সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবটা ছিল অসম্পূর্ণ। কয়েক বছর পর পাউলির বিটা ক্ষয়ের ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে পরিপূর্ণ এক তত্ত্ব হাজির করেন ফার্মি। এতে তিনি নতুন একধরনের বলের কথা প্রস্তাব করেন; দুর্বল নিউক্লিয়ার বল।

পাউলি অনুমান করেছিলেন, ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রন ছাড়া পরমাণুতে সম্ভবত আরেকটি কণাও আছে, যার কোনো চার্জ নেই, ভরও নগণ্য। এই কণাই হয়তো বিটা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। ফার্মির ব্যাখ্যায় এই কণার কথা বলা হয়েছিল। কণাটির নাম তিনি দেন নিউট্রিনো। নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রিনোর মধ্যে একটা নতুন ধরনের দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার কথা বলেন তিনি। এর কারণেই ইলেকট্রনের সঙ্গে নিউট্রিনো কণারও নিঃসরণ হয়। আর ক্ষয়ের আগের ও পরের নিউক্লিয়াসের শক্তির যে তফাত, ঠিক প্রয়োজনীয় সেই পরিমাণ শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো। এর মাধ্যমে শক্তির সংরক্ষণশীলতার নিয়মটা বাঁচিয়ে দেন তিনি।

এ বিষয়ে একটা পেপার বিখ্যাত *নেচার* জার্নালে পাঠান ফার্মি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবটা এত দুঃসাহসী ছিল যে *নেচার* জার্নাল কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। তাই সেগুলো ছাপাতেও রাজি হয়নি। অনেক পরে অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে নিজেদের বড় ভুল বলে উল্লেখ করেন জার্নালটির সম্পাদক। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে ইতালিয়ান জার্নাল *লা রিসারকা সায়েন্টিফিকা*, *ইল ন্যুভু সিমেন্তো* এবং জার্মান জার্নাল *জেইশ্চফট ফুর ফিজিক*-এ পেপারগুলো প্রকাশ করেন ফার্মি। তিনি এসব পেপারে বিটা ক্ষয়ের ব্যাখ্যার রূপরেখা পেশ করেন।

ফার্মির তত্ত্বটা পদার্থবিদদের মনে ধরল। কিন্তু নিউট্রিনো কণা কেউই কখনো দেখেনি। কণাটার অস্তিত্ব যদি সত্যিই থাকে, তাহলে মৌলিক কণাদের মধ্যে এর অবস্থান কোথায়? আবার এ সমস্যার সমাধান কখনো হলেও আরেকটা সমস্যা রয়েই যায়। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন কণাদের একত্রে ধরে রাখার জন্য দুর্বল বল যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাহলে সে রকম শক্তিশালী বল কোথায়? কাজেই পরমাণুর সুদৃঢ় গাঁথুনির জন্য আরও পরিপূর্ণ মডেল দরকার। কোথায় পাব তারে?

ঠিক এ সময় দারুণ এক সমাধান দিয়ে পদার্থবিদদের তাক লাগিয়ে দেন ওই অজ্ঞাত-অখ্যাত হিদেকি ওগাওয়া।

২.

হিদেকির জন্ম জাপানের টোকিওতে, ১৯০৭ সালের ২৩ জানুয়ারি। বেড়ে উঠেছেন কিয়োটো শহরে। তিনি ছিলেন পরিবারের সাত সন্তানের মধ্যে তৃতীয়। ছোটবেলায় অন্য সন্তানদের মধ্যে হিদেকিকে মোটেও মেধাবী বলে মনে করেননি তাঁর বাবা। তবে হিদেকির মেধার আঁচ পান তাঁর স্কুলের প্রিন্সিপাল। একবার একটা উপপাদ্যকে প্রচলিত নিয়মের বাইরে ভিন্নভাবে প্রমাণ করেন হিদেকি। তাঁর এই গাণিতিক দক্ষতায় মুগ্ধ হন প্রিন্সিপাল। হিদেকির মধ্যে ভালো সম্ভাবনা দেখতে পান তিনি। শিক্ষকের উৎসাহে বড় হয়ে গণিতবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন হিদেকি।

ছেলের ওপর হতাশ হয়ে তাঁর বাবা যখন তাঁকে টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তিকরার সিদ্ধান্ত নেন, তখন এগিয়ে আসেন ওই প্রিন্সিপাল। তিনি হিদেকিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পরামর্শ দেন। এমনকি প্রয়োজনে তাঁকে দত্তক নেওয়ার প্রস্তাবও দেন। শেষমেশ নমনীয় হন হিদেকির বাবা। ১৯২৯ সালে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন হিদেকি। এ সময় তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে কণাপদার্থবিজ্ঞানে।

তিন বছর পর হিদেকি বিয়ে করেন সুমি ইউকাওয়াকে। ফলে জাপানি রীতি অনুযায়ী তাঁর পদবি বদলে যায়। হিদেকি ওগাওয়া থেকে হিদেকি ইউকাওয়াতে পরিণত হন তিনি। ১৯৩৩ সালে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হওয়ার প্রস্তাব পান। দ্রুতই সাড়া দেন এতে। কারণ, এতে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন বলে মনে করেছিলেন তিনি। দুই বছর পর, মানে ১৯৩৫ সালে নিজের জীবনের সেরা কাজটি করেন হিদেকি। এ সময় পদার্থবিজ্ঞানের সেকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং সমস্যাটা নিয়ে কাজ করছেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের কজন দিকপাল। এঁদের মধ্যে রয়েছেন পাউলি, হাইজেনবার্গ, ফার্মিসহ অনেকে। সমস্যাটা অচিরেই বুঝতে পারেন হিদেকি। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন আর নিউট্রন কীভাবে গাদাগাদি হয়ে একত্রে থাকে, সেটা কেউ বুঝতে পারছেন না। প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আরেকটা ধনাত্মক প্রোটনের সঙ্গে থাকলে স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী, তাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ ঘটার কথা। চুম্বকের একই মেরু যেমন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, অনেকটা সে রকম। তা-ই যদি হয়, তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠিত হওয়ার কথা নয়; কিন্তু পরমাণু যে বহাল তবিয়তে টিকে আছে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি-আপনি, চারপাশের বস্তুজগৎ, পৃথিবী, মহাবিশ্বসহ সবকিছু। তাহলে রহস্যটা কী?

রহস্যটা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে একটা তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন হিদেকি। তাঁর তত্ত্বমতে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নতুন ধরনের শক্তিশালী একটা মিথস্ক্রিয়া ঘটে। একে তিনি বললেন, শক্তিশালী পারমাণবিক বল বা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স। তাঁর হিসাবে, নিউক্লিয়াসের ভেতর এই বলের শক্তি বিকর্ষণধর্মী বৈদ্যুতিক বলের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি। কিন্তু নিউক্লিয়াসের বাইরে এই বল দুর্বল। তাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাব দেখা যায় না।

এই শক্তিশালী বলের চরিত্র হিসাব কষে গাণিতিকভাবে দেখান হিদেকি। সে জন্য ব্যবহার করেন বিশেষ আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রগুলো। এখানেই শেষ নয়। আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি অনুমান করেন, শক্তিশালী বলের জন্য কোনো বলবাহী কণা থাকতে পারে। অর্থাৎ বলবাহী কণাটি কাজ করে বাহক হিসেবে। প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে বল বহন করে। ফোটন যেমন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের বাহক, সে রকম। আবার সেই বিশেষ কণার চরিত্র কেমন হবে, তা-ও হিসাব করে বের করেন তিনি। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতা সমীকরণের সমন্বয়ে কণাটির সম্ভাব্য ভরও নির্ণয় করেন। তিনি অনুমান করলেন, কণাটির ভর প্রোটনের চেয়ে কম, কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ৩০০ গুণ বেশি। মানে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি একটা ভর। পরে কণাটির নামকরণ করা হলো মেসন (Meson)। গ্রিক শব্দ 'মেসো' (meso) অর্থ 'মাঝারি'। ভর প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি বলেই এমন নাম।

১৯৩৫ সালে শক্তিশালী পারমাণবিক বলের নতুন মডেল এবং নতুন কণা সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন হিদেকি। সেটা লেখা হয়েছিল বেশ স্পষ্টভাবে। সেটাই তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সেটা যেন কারও নজরই কাড়ল না। একরকম অবহেলায় পড়ে রইল জার্নালের পাতায়। সম্ভবত এর কারণ, বিজ্ঞান সমাজে হিদেকিকে উটকো ভেবেছিলেন অন্য বিজ্ঞানীরা। কোথাকার কোন অচেনা জাপানি যুবক এমন জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারবে, সে কথা কেউ বিশ্বাসই করতে পারেননি। অনেকটা যেন হাতি-ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জলের মতো ব্যাপার। তাই তাঁর তত্ত্বটার দিকেও তেমন নজর দেয়নি কেউ। তবে তত্ত্ব আর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক থাকলে অখ্যাত-অজ্ঞাত কারও গবেষণাও শেষ পর্যন্ত বৃথা যায় না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। হিদেকির মডেলটাও একসময় আলোচনার ঝড় তুলল বিজ্ঞানীদের ভেতর। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করা মেসন নামের নতুন কণাটি খোঁজার পরিকল্পনাও করলেন অনেকে। এই অগ্নিপরীক্ষায় পাস করতে পারলেই জাতে উঠবেন হিদেকি ও তাঁর পরমাণু মডেল।

মেসন কণার ভর প্রোটনের চেয়ে কম হলেও তা যথেষ্ট ভারী। কারণ, ইলেকট্রনের চেয়ে মেসন প্রায় ৩০০ গুণ ভারী। আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুসারে, বেশি ভর বেশি শক্তির সমতুল্য। গবেষণাগারে এ রকম ভারী কণা তৈরি করতে অনেক শক্তি দরকার। সেটা সে যুগের জন্য বেশ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ছিল। কাজেই বাকি থাকে আর একটিমাত্র বিকল্প। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উচ্চশক্তিতে উৎপন্ন কণাদের মধ্যে তা খোঁজার চেষ্টা করে দেখা। সেখানেই হয়তো মিলতে পারে সঠিক উত্তর। সেখানেই নির্ধারিত হবে হিদেকি ও তাঁর মডেলের ভাগ্য।

জাপানি বিজ্ঞানী হিদেকি ইউকাওয়া

৩.

হিদেকির প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ২৩ বছর আগের কথা। ১৯১২ সাল। অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ভিক্টর হেস ফ্রান্সিস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোমাঞ্চকর একটা আবিষ্কার করেন। উচ্চশক্তির বিকিরণ শনাক্ত করার জন্য তিনি খুব সংবেদনশীল একটা ডিটেক্টর তৈরি করেন। এরপর বেলুনে চেপে রওনা দেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে। পরীক্ষায় দেখতে পান, শুরুতে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণের মাত্রা কমে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার ওপরে ঝট করে বিকিরণের মাত্রা বেড়ে যায় ব্যাপকভাবে। তিনি নিশ্চিত হলেন, এ বিকিরণ অবশ্যই পৃথিবী থেকে আসছে না। তাহলে আসছে কোথা থেকে?

এটা বোঝার জন্য সূর্যগ্রহণের সময়ও বেলুনে চেপে আকাশে ওঠেন ভিক্টর হেস ফ্রান্সিস। ইলেকট্রোস্কোপ বিকিরণ মাপেন। হিসাবমতো, সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য থেকে আসা বিকিরণ চাঁদে বাধা পাওয়ার কথা। কাজেই এর উৎস যদি সূর্য হয়ে থাকে, তাহলে বিকিরণের মাত্রা কম হওয়ার কথা। কিন্তু বিকিরণের মাত্রা মেপে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন হেস। পরিমাপে বিকিরণের তীব্রতার কোনো হেরফের পাওয়া গেল না। কাজেই এ বিকিরণ অবশ্যই সূর্য থেকে আসছে না। তাহলে আসছে কোথা থেকে?

যৌক্তিকভাবে হেস সিদ্ধান্তে এলেন, এসব বিকিরণ যদি সূর্য থেকে না এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই বাইরের গভীর মহাকাশ থেকে আসছে। এই মহাজাগতিক রশ্মির রহস্যের সমাধান না হলেও আরও বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকান। তিনিও একই ফলাফল পেলেন। মিলিকানই এই বিকিরণের নামকরণ করেন 'কসমিক রে', বাংলায় আমরা যাকে বলি 'মহাজাগতিক বিকিরণ' বা 'মহাজাগতিক রশ্মি'।

হিদেকির প্রস্তাবিত মেসন কণা তৈরির জন্য এই রশ্মিতে যথেষ্ট শক্তি আছে। মহাকাশ থেকে সজোরে ছুটে আসা মহাজাগতিক রশ্মি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন মেসন কণা তৈরি হতে পারে। এর কারণটা আইনস্টাইনের বিখ্যাত ভর-শক্তির সমীকরণ থেকে ততদিনে জানা হয়ে গেছে—শক্তি রূপান্তরিত হয়ে বস্তুতে পরিণত হতে পারে। কাজেই উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মেসন কণার মতো নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে, তা বিজ্ঞানীরা জানেন, বোঝেন।

ক্যালটেকে মিলিকানের অধীনে পোস্টডক্টরাল গবেষক দলে তখন ছিলেন কার্ল ডেভিড অ্যান্ডারসন নামের এক তরুণ। মিলিকানের পরামর্শে তখন মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন অ্যান্ডারসন। উপপারমাণবিক কণা (প্রচলিত ভাষায় ভুলভাষে লেখা হয় 'অতিপারমাণবিক কণা') শনাক্ত করতে ব্যবহার করা হতো ক্লাউড চেম্বার। এ ধরনের একটা ডিটেক্টরের কিছুটা উন্নত সংস্করণ বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। এতে একটা পাত্রে থাকত পানির বাষ্প ও গ্যাসের মিশ্রণ। উচ্চশক্তির কোনো কণার সঙ্গে এই পাত্রের গ্যাস মিশ্রণের সংঘর্ষ ঘটলে কণাটির গতিপথে একটা ঘনীভূত পানির ফোঁটা দেখা যায়। অ্যান্ডারসনের ক্লাউড চেম্বারে কণার গতিপথের তুলনামূলক ভালো ছবি তোলা যেত। শুধু তা-ই নয়, চার্জিত কণাটির গতিপথ একটা চুম্বকের কারণে কতটুকু বেঁকে যায়, তা-ও নির্ণয় করা যেত। অ্যান্ডারসন দেখতে পান, মহাজাগতিক কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত

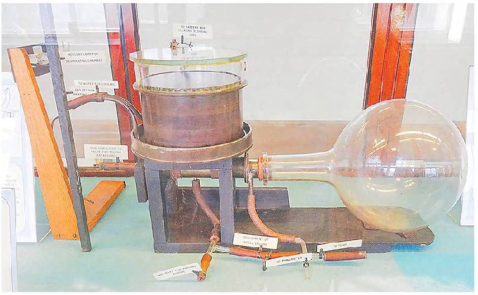

সে যুগে কণা শনাক্ত করতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতেন এ ধরনের ক্লাউড চেম্বার

করলে একই সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণার ফোয়ারার সৃষ্টি হয়। ১৯৩২ সালে তাঁর তোলা একটা ছবিতে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখা গেল। ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রনের সমান ভরের একটা কণা, কিন্তু ঋণাত্মক চার্জ হিসেবে কণাটির যেদিকে যাওয়ার কথা, ওটার গতিপথ তার উল্টো দিকে। এর সোজা মানে হলো, ইলেকট্রনের সমান ভরের ওই কণার চার্জ ধনাত্মক।

সেটাই ছিল প্রথম কোনো প্রতিকণা বা পজিট্রন পর্যবেক্ষণ। এ কণার কথা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পল ডিরাক। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৬ সালে ভিক্টর ফ্রান্সিস হেসের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পান অ্যান্ডারসন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বছর। একই বয়সে ১৯৩৩ সালে নোবেল পান পল ডিরাকও; রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রণয়ন এবং পজিট্রন কণার অস্তিত্ব অনুমানের জন্য।

অবশ্য অ্যান্ডারসনের বানানো ক্লাউড চেম্বার আরও কিছু চমক দেখানোর অপেক্ষায় ছিল। ১৯৩৬ সালে অ্যান্ডারসন ও তাঁর গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী সেথ নেডডারমেয়ার ক্লাউড চেম্বারে আরেকটা অদ্ভুত কণার গতিপথ খেয়াল করেন। তাঁদের হিসাব-নিকাশে দেখা গেল, কণাটি ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ২০৭ গুণ ভারী। চার্জ ঋণাত্মক। এক বছর আগে হিদেকি ইউকাওয়া শক্তিশালী পারমাণবিক বলের জন্য যে মেসন কণার কথা অনুমান করেছিলেন, প্রায় তার কাছাকাছি। ব্যাপারটা জানতে পেরে অচিরেই *নেচার* জার্নালে একটা নোট পাঠালেন হিদেকি। নোটে উল্লেখ করলেন, এই কণা তাঁর প্রস্তাবিত মেসন কণা হতে পারে। কিন্তু তাঁর চিঠিটা প্রত্যাখ্যান করলেন *নেচার* জার্নালের সম্পাদক। তাতে হাল ছাড়লেন না হিদেকি। *প্রসিডিং অব দ্য ফিজিকো-ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি অব জাপান* জার্নালে ১৯৩৭ সালে নোটটি প্রকাশ করেন তিনি।

শুধু অ্যান্ডারসনই নন, আরও অনেক গবেষকই প্রায় একই সময় একই ভরের কণা শনাক্ত করতে শুরু করেছিলেন। ফলে ছট করেই হিদেকি ও তাঁর পরমাণুর শক্তিশালী বলের মডেলটা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করল। আসলে সেটা তাঁর প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু কিছু অসংগতি ছিল এখানে। যে কণা শনাক্ত বা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, তার ভরের সঙ্গে হিদেকির মেসন কণার ভরের কিছুটা তফাত ছিল। শুধু তা-ই নয়, প্রায় দশ বছর পর জানা গেল আরেকটি বাজে ব্যাপার। ১৯৪৬ সালে পরীক্ষায় ধরা পড়ল, ওই কণা নিউট্রন বা প্রোটনের সঙ্গে জোরালোভাবে মিথস্ক্রিয়া করে না। কাজেই সেটা কোনোভাবেই হিদেকির অনুমিত মেসন কণা হতে পারে না।

এদিকে তত দিনে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশক্তির কণা অনুসন্ধানে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানীরা। এ রকমই একটা ডিটেক্টর বসানো হয়েছিল ভিয়েনার রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে। সেখানে কর্মরত তরুণ বিজ্ঞানী মেরিয়েটা ব্লাউ এমন একটা ডিটেক্টর ব্যবহার করেছিলেন, যেটা দিয়ে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে সরাসরি কণার গতিপথ রেকর্ড করা যায়।

ভারতেও দেবেন্দ্র মোহন বোস ও বিভা চৌধুরী ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলের কণা শনাক্ত করার নতুন একটা পদ্ধতি ডিজাইন করেছিলেন। ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে এ বিষয়ে *নেচার* জার্নালে চারটি পেপার প্রকাশ করেন তাঁরা। এই দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী এমন একটা কণা শনাক্ত করার কথা জানান, যেটা হিদেকির অনুমিত মেসন কণা হতে পারে। কিন্তু তত দিনে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আড়ালে প্রায় সবকিছু চাপা পড়ে গেছে। এ গুরুত্বপূর্ণ খবরও বাদ গেল না। আবার যুদ্ধের কারণে এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপকরণও সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাতে গবেষণায়ও ভাটা পড়ল। তাই হিদেকির মেসন রহস্যই থেকে যায় আরও কিছুদিন।

সেই বিশ্বযুদ্ধ শেষে, ব্রিটিশ পদার্থবিদ সিসিল পাওয়েল আর তাঁর সহকর্মীরা শেষ পর্যন্ত সমাধান করেন এ রহস্যের। ১৯৪৭ সালে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণে তাঁরা দেখতে পান, মাঝারি ভরের দুই ধরনের কণা রয়েছে। এর মধ্যে একটার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন হিদেকি। অন্যটি হালকা ভরের লেপটন কণা। পরে এর নাম দেওয়া হয় মিউয়ন। এই কণা শনাক্ত করা হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের কাছে। হিদেকির অনুমান করা কণাটিকে এখন বলা হয় পাই মেসন বা পায়ন। এটি পাওয়া যায় বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে। এভাবেই ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃতি পান হিদেকি। এর দুই বছর পর, ১৯৪৯ সালে প্রথম জাপানি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান তিনি। আরও দুই বছর পর নোবেল পান সিসিল পোয়েল। ফটোগ্রাফিক পদ্ধতির উন্নয়ন এবং পায়ন কণা আবিষ্কারের স্বীকৃতি ছিল এ পুরস্কার।

হিদেকির শক্তিশালী পারমাণবিক বলের মডেল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা পাই মেসন বা পায়ন কণা আবিষ্কারকে একটা বড় ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে পরের দশকে আরও গবেষণার সূত্রে মেসন থিওরিকে আর মৌলিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বরং কণাপদার্থের জন্য এখন সর্বেসর্বা হলো স্ট্যান্ডার্ড মডেল। তবে হিদেকির মেসন বিনিময়ের ধারণাটি এখনো ব্যবহৃত হয় পদার্থবিজ্ঞানে।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

সূত্র : *ক্লস টু দ্য কসমস*/ সোহিনি ঘোষ; *অ্যাটম : জার্নি অ্যাক্রস দ্য সাবঅ্যাটমিক কসমস*/ আইজ্যাক আসিমভ; *দ্য গ্রেট আননোন*/ মার্কাস দ্য স্যাটই; উইকিপিডিয়া

উৎকর্ষ HSC 2025

GAMECHANGER!

এইচএসসি ২০২৫ ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্স

এখন সময় ঘুরে দাঁড়ানোর

মামুনের গল্পটা তোমার কাছে পরিচিত লাগতে পারে। সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল অনেক স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সে তাল মিলিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। একটার পর একটা ক্লাস, এসাইনমেন্ট আর পরীক্ষা, তার ওপর বিশাল সিলেবাস! এই করতে করতে দেখা গেল এইচএসসি পরীক্ষা চলে এসেছে। ও এখন ভাবছে "সব শেষ হয়ে গেল, আর কামব্যাক করার উপায় নেই"।

শারমিনের গল্পটাও তোমার কাছে হয়তো অপরিচিত লাগবে না। সে প্রথম থেকেই পড়াশোনায় সিরিয়াস। প্রতিটি ক্লাস নিয়মিত করেছে, প্রতিটি অধ্যায় তার আয়ত্তে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, এইচএসসি পরীক্ষা যখন কাছে এসে পড়েছে, তখন থেকে সে পিছিয়ে যেতে লাগল। অতি আত্মবিশ্বাসের কারণে কয়েকদিন একটু পড়াশোনায় গাফিলতি দেয়ার ফলে এখন তার কাছে মনে হচ্ছে অনেক অনেক পিছিয়ে গেছে। আর মনে হয় প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল হবে না! এখন কি পুরাতন পড়া ভালোমতো রিভিশন দিবে, না নতুন পড়া ধরবে?

তুমি কি মামুনের মতো হতাশ, নাকি শারমিনের মতো দোটানায়?

তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, তোমার জন্যেই আমাদের এইচএসসি ২৫ গেমচেঞ্জার কোর্স! সর্বোচ্চ নাম্বারের জন্যে সঠিক স্ট্রাটেজি এবং গাইডলাইনের পাশাপাশি মানসিকভাবে ভালো থাকার উপায়ও জানবে আমাদের এই কোর্সে।

তোমার জন্য এই কোর্স কেন অপরিহার্য?

শেষ সময়ে গোছানো প্রস্তুতি এবং সঠিক স্ট্রাটেজির মাধ্যমে যে কেউ যেন সর্বোচ্চ নাম্বার পেতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে এই কোর্সটি সাজানো হয়েছে।

- যদি আগের পড়াশোনা ঠিকঠাক না করেও থাকো, সমস্যা নেই।
- বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা হবে।
- থাকছে পর্যাপ্ত পরিমাণ CQ এবং MCQ
- শুধু বোর্ড পরীক্ষা নয়, ভর্তি পরীক্ষার চাহিদাও মাথায় রেখে গাইডেন্স দেওয়া হবে।

উৎকর্ষ

09613715715

আমাদের লক্ষ্য হলো
তোমাকে সর্বোচ্চ নম্বর পেতে সাহায্য করা।

কোর্সটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন তোমার কোনো দিক দিয়েই কোনো কমতি না থাকে। ৯টি সাবজেক্ট ম্যাপিং ক্লাস ও ৯টি বোর্ড প্রশ্ন সমাধানের ক্লাসের মাধ্যমে তোমার ভিত্তি হবে মজবুত, আর টেস্ট পেপার সলভ ক্লাসে তুমি অর্জন করবে গভীর দক্ষতা। পরীক্ষার আগে সঠিক কৌশল শেখাতে থাকছে ৫টি এক্সাম স্ট্রাটেজি ক্লাস। ২০০টি লাইভ ক্লাসে অ্যানিমেশন, সিমুলেশন ও হাতে-কলমে উদাহরণসহ তোমার শেখাটা হবে অনন্য। সার্বক্ষণিক Q&A সাপোর্ট থাকছে যাতে কোনো সমস্যায় পড়লে সমাধান পেতে পারো। এছাড়াও তুমি গত বছরের ফাইনাল প্রিপারেশন কোর্সের ২০০টি আর্কাইভড ক্লাসের এক্সেস পাবে।

মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে থাকছে বিশেষ ওয়েবিনার "কথা বলো উৎকর্ষের সাথে" এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫টি স্পেশাল ক্লাস, যা তোমাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী থেকে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে।

মোটকথা, পরীক্ষায় ভালো করতে তোমার যা যা দরকার তার সবই পাবে আমাদের এই কোর্সে। এতদিন যদি তুমি ভালো করে প্রস্তুতি না নিয়ে থাকো, তার জন্যে যেমন এই কোর্স, এতদিন ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছো যারা, তাদের জন্যেও এই কোর্স, যেন শেষ মুহূর্তে পা হড়কে না যায়।

আমাদের এই কোর্সে থাকছে ৭টি বিষয়। বাংলা, ইংরেজি, আইসিটি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং উচ্চতর গণিত। তবে তুমি সায়েন্সের ৪টি বিষয়ের আলাদা প্যাকেজ এবং বাংলা, ইংরেজি, আইসিটি- এই তিনটি বিষয় আলাদাভাবেও নিতে পারবে।

এখন চলছে
আর্লিবার্ড অফার

সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে
এনরোল করে নেয়ার এখনই সেরা সময়!

চলো চাপহীনভাবে পড়াশোনা করে
গেমটা চেঞ্জ করে দেয়া যাক!

www.utkorsho.tech

উৎকর্ষ

নিষিদ্ধ ইতিহাস

ডিউক জন

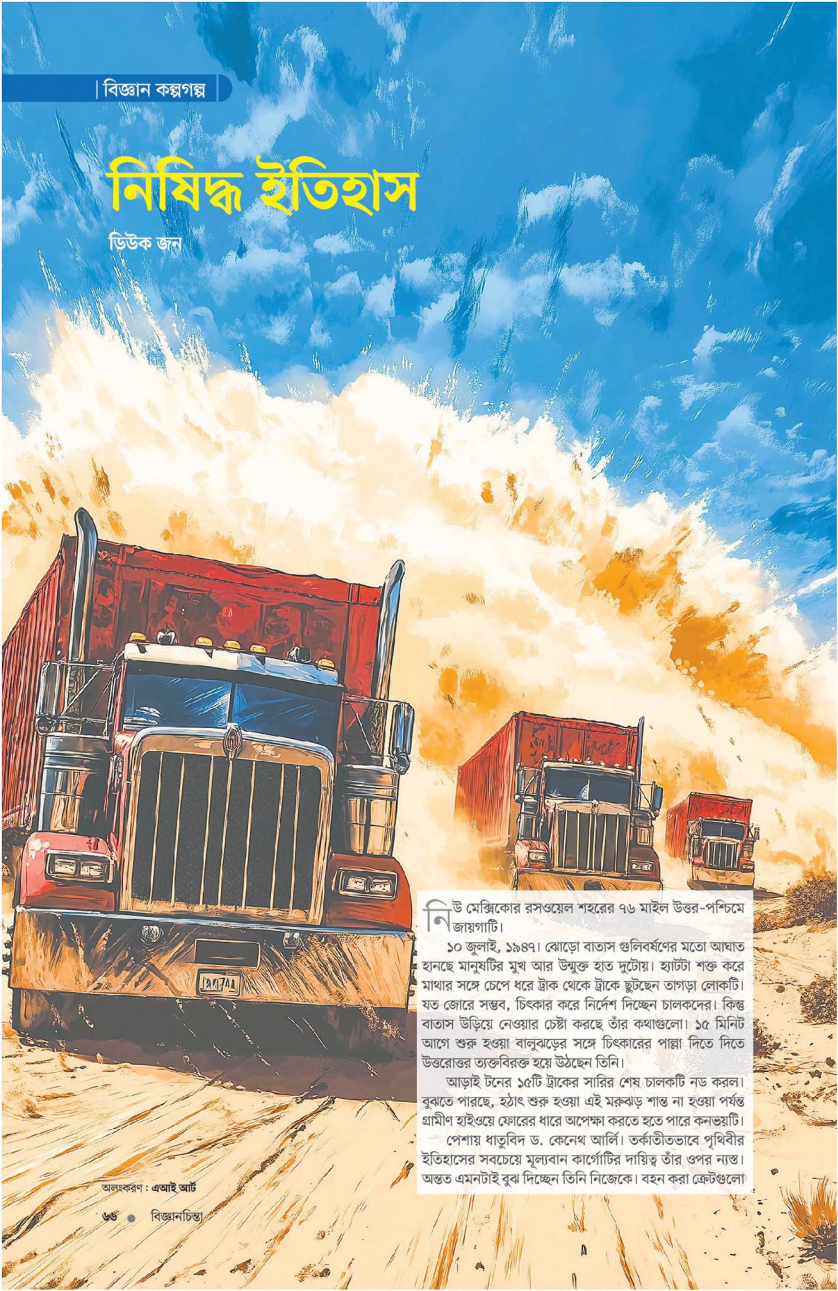

নিউ মেক্সিকোর রসওয়েল শহরের ৭৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জায়গাটি।

১০ জুলাই, ১৯৪৭। ঝোড়ো বাতাস গুলিবর্ষণের মতো আঘাত হানছে মানুষটির মুখ আর উন্মুক্ত হাত দুটোয়। হ্যাটটা শক্ত করে মাথার সঙ্গে চেপে ধরে ট্রাক থেকে ট্রাকে ছুটছেন তাগড়া লোকটি। যত জোরে সম্ভব, চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছেন চালকদের। কিন্তু বাতাস উড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তাঁর কথাগুলো। ১৫ মিনিট আগে শুরু হওয়া বালুঝড়ের সঙ্গে চিৎকারের পাল্লা দিতে দিতে উত্তরোত্তর ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠছেন তিনি।

আড়াই টনের ১৫টি ট্রাকের সারির শেষ চালকটি নড করল। বুঝতে পারছে, হঠাৎ শুরু হওয়া এই মরুঝড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত গ্রামীণ হাইওয়ে ফোরের ধারে অপেক্ষা করতে হতে পারে কমভয়টি।

পেশায় ধাতুবিদ ড. কেনেথ আর্লি। তর্কাতীতভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান কার্গোটির দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। অন্তত এমনটাই বুঝ দিচ্ছেন তিনি নিজেকে। বহন করা ক্রেটগুলো

অলংকরণ : এআই আর্ট

যাতে নিরাপদে নেভাডায় পৌঁছায়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য গ্যারিসন লি নিজে নির্বাচন করেছেন তাঁকে। হ্যাঁ, উড়ে যেতে পারতেন তাঁরা লাস ভেগাসের আর্মি এয়ারফিল্ডে। কিন্তু আকাশপথে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিরাপদ ট্রাক কনভয়ে করে কার্গো পরিবহনের তাগিদ দিয়েছে তাঁদের। ডক্টর নিজের সেরা ১০ নিরাপত্তাকর্মীকে নিযুক্ত করেছেন অস্বাভাবিক কার্গোটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য।

বাতাসের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে প্রথম ট্রাকের কাছে ফিরে গেলেন ড. আর্লি। ভেতরে বসা চালকের উদ্দেশে হাত নেড়ে এগিয়ে গেলেন সবুজ সরকারি শেভ্রোলেটটির দিকে। ওটার পেছনের দরজা খুলতে খুলতে শুকরিয়া অনুভব করলেন গাড়িটির নিরাপদ আশ্রয় রয়েছে বলে।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে ঝাড়লেন ডক্টর। ছোট একটা ধুলার মেঘ তৈরি হওয়ায় কেশে উঠল তাঁর সিকিউরিটি চালক।

দুঃখ প্রকাশ করে পাশের সিটে হ্যাটটা ছুড়ে দিলেন আর্লি। কোটের পকেট থেকে বের করে নিলেন পুরু কাচের চশমা। ওটা নাকে লাগিয়ে সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি, সামনের সিটের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখলেন কনুই দুটো। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, কপাল খুলল রেডিওর ব্যাপারে?'

টু শব্দটিও করছে না, ডক্টর। বিরস কণ্ঠে বলল চালক, 'খুব সম্ভবত ঝড়ের কারণে। খারাপ আবহাওয়ার পাল্লায় পড়লে বোঝা যায়, যতখানি বলা হয়, আসলে ততখানি ভালো নয় আর্মির বাতলি করা রেডিওগুলো।'

'কম্ম কাবার! পিছিয়ে আসতে হবে জানলে আমার তরুণ অফিসার।

উইন্ডশিল্ড ভেদ করে চাইলেন ডক্টর। আশ্চর্য হলেন কালো পোশাকধারী তিন ব্যক্তিকে দেখে। চোখজোড়া সরু করে বালুর ভেতর দিয়ে তাকানোর চেষ্টায় নাকের ওপর নেড়েচেড়ে নিলেন তিনি চশমাটা। রাস্তার আড়াআড়ি বয়ে চলেছে বালুর ঝড়।

'হুড আর গগলস পরেছে নাকি ওরা?' প্রশ্ন তাঁর।

জবাব না দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল লেফটেন্যান্ট। ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল ড. আর্লির কথাগুলো, ছড়িয়ে দিল বালুর ভেতর।

'ইউনাইটেড স্টেটসের সরকারি কনভয় এটা। তোমরা...।'

এটুকুই বলতে পারল শুধু তরুণ লেফটেন্যান্ট। আতঙ্কিত আর্লির চোখের সামনে তিন আগন্তুকের মাঝখানের জন টমসন সাবমেশিনগানের মতো দেখতে অস্ত্রটা ওপরে তুলল। তিন পশলা গুলি এসে বিঁধল আর্মি অফিসারের ঊর্ধ্বাঙ্গে। প্রথমে দরজার বাজুতে, এরপর রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ল হতভাগ্য অফিসার। বাতাসের কারণে সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল লেফটেন্যান্টের পিঠ ফুঁড়ে বেরোনো রক্তের কুয়াশা।

'ঈশ্বর!' আঁতকে উঠলেন আর্লি।

আচমকা উপলব্ধি করলেন তিনি, এ মুহূর্তে আশ্রয় নেওয়ার সেরা জায়গা নয় গাড়িটা। হঠাৎ সিট থেকে ঝাঁপ দিলেন বালু আর বাতাসের মধ্যে। একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়িয়ে সাময়িক আড়াল নিলেন শেভির পেছনে। একদম কাজ করতে চাইছে না মাথাটা। ঘাড় নিচু করে সারির প্রথম ট্রাকটির দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় পিঠে

রেডিও হ্যান্ডসেট নামিয়ে রেখে বেল্টে আটকানো হোলস্টার থেকে কোল্ট পয়েন্ট ৪৫ বের করে নিল তরুণ অফিসার

পেছনটা জ্বালিয়ে দেবেন লি। কারণ, তাঁর শিডিউলে গড়বড় হয়ে যাচ্ছে এতে।' পাশের জানালা দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করলেন আর্লি, 'এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বসে অপেক্ষা করার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'আমারও না, ডক্টর। সত্যি কথাটাই বলি আপনাকে। ক্রেটগুলোয় কী রয়েছে, জানার পর থেকে গতকাল দেখা দুনিয়াটা পাল্টে গেছে বলে মনে হচ্ছে আমার।' একটা ঢোঁক গিলে আর্লির উদ্দেশে ঘাড় ঘোরাল চালক, 'অদ্ভুত সব ফিসফাস চলছে এ নিয়ে। শুনলে পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়ার অবস্থা!'

তরুণ আর্মি লেফটেন্যান্টের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আর্লি। মাত্র মাস তিনেক হলো, দলে যোগ দিয়েছে ছেলেটি।

'আলবত বুঝতে পারছি, কী বলতে চাইছ তুমি।' বললেন তিনি, 'নতুন কমপ্লেক্সে জিনিসটা সহিসালামতে পৌঁছে না দেওয়া অবধি সোয়াস্তি নেই কারও।'

মড়া দেখেও অতখানি ভয় পেতেন না আর্লি, যতটা পাচ্ছেন তিনি হতচ্ছাড়া ওই ১০ ফুট বাই ১০ ফুট মাপের কনটেইনারগুলোকে। গুঞ্জন উঠেছে, খাঁচা নাকি ওগুলো! প্রাণপণে ব্যাপারটা চেপে রাখতে চাইছেন লি। কিন্তু খাঁচাগুলোর মধ্যে যে জিনিস রয়েছে বলে ভাবছে সবাই, সেটা যদি সত্যি হয় তো...!

শরীরের কাঁপুনি নিয়ন্ত্রণ করার বৃথা চেষ্টায় চোখ দুটো বুজে ফেললেন ডক্টর।

'এরা আবার কারা?' হঠাৎই গলা চড়ে গেল লেফটেন্যান্টের।

আর্মি অফিসারের দিকে চোখ মেলে তাকালেন আর্লি। দেখতে পেলেন, রেডিও হ্যান্ডসেট নামিয়ে রেখে বেল্টে আটকানো হোলস্টার থেকে কোল্ট পয়েন্ট ৪৫ বের করে নিল এসে বিঁধল পয়েন্ট ৪৫ ক্যালিবারের পরপর পাঁচটি বুলেট।

রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পাশের খন্দের মধ্যে পড়ে গেলেন হতভাগ্য আর্লি। শরীরের রক্ত শুষে নিচ্ছে বালু, কালো কমব্যাট গিয়ার পরা আগন্তুকদের একজনকে নিজের ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখলেন ভদ্রলোক। চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে আরেকটু ঝুঁকে এল সে, এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে দস্তানা পরা একটা হাত রাখল আর্লির কম্পিত কাঁধে।

'সরি, ডক্টর!' ঝড় ছাপিয়ে শোনার মতো করে বলল অনাহূত আগন্তুক, 'কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশটা রক্ষা করার হ্যাপা যে কতখানি, সেটা যদি বুঝত আপনাদের ওপরওয়ালা!'

বিভ্রান্ত আর্লি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন লোকটির দিকে।

চকিতে চারপাশটা জরিপ করে মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক। এরপর মুখ নিয়ে এল ড. আর্লির একদম কানের কাছে, 'দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ডক্টর, আপনি আর আপনার লোকেরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন আমেরিকা, তথা দুনিয়ার নিরাপত্তার পথে।' বিষণ্ন শোনাল তার গলাটা। মাথা নাড়ল আফসোসের ভঙ্গিতে। গুলিবিদ্ধ আর্লি শেষনিশ্বাস ফেলতেই সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের নির্দেশ দিল সে চিৎকার করে।

নিষ্ঠুর পরিণতি বরণ করতে হলো কনভয়ের বাকিদেরও।

মরুভূমির ছোট এয়ারবেজটি থেকে রহস্যময় কার্গোসহ কোথায় যে হারিয়ে গেল এরপর হতভাগ্য লোকগুলো, জানে কেবল ঈশ্বর আর নীলনকশার পেছনের মানুষগুলো! ৭৭টি বছর ধরেই অমীমাংসিত রয়ে গেছে রহস্যটি।

আর এটি হচ্ছে লিখিত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গ্রহান্তরের প্রাণিবিষয়ক ধামাচাপা!

বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

একজন কৃষকের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার কাহিনি

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ

২০টি নতুন জাতের ধান আবিষ্কার করেছেন তিনি। সেগুলো উচ্চফলনশীল, চাষ হচ্ছে মাঠে। এ সবই তিনি শিখেছেন নিজে নিজে। শিখেছেন, কীভাবে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা যায় নতুন ধান। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত কৃষক-বিজ্ঞানী সম্মেলনে। স্বশিক্ষিত এক কৃষকের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর কাহিনি...

পিতৃ-মাতৃহীন এক শিশু রাজশাহীতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে গিয়ে বসে থাকেন। দেখেন, বিজ্ঞানীরা কীভাবে ধানের নতুন জাত আবিষ্কার করছেন। দেখতে দেখতে শিশুটি শিখে যান কীভাবে এক জাতের ধানের জিনের সঙ্গে আরেকটি জাতের সংকরায়ণ করে নতুন জাতের ধান তৈরি হচ্ছে। শৈশবে মা-বাবা হারানোর কারণে তিনি স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। কিন্তু আপন চেষ্টায় হয়ে উঠেছেন স্বশিক্ষিত কৃষিবিজ্ঞানী। গত ৬ থেকে ১০ নভেম্বর তিনি মালয়েশিয়ায় কৃষক-বিজ্ঞানী সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যোগ দেন।

দেশে নিজের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৫ সালে 'কৃষিতে উচ্চফলন' ক্যাটাগরিতে জাতীয় কৃষি পদক (সোনা) পেয়েছেন। এই কৃষকের নাম নূর মোহাম্মদ। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর তানোর উপজেলার গোল্লাপাড়া গ্রামে।

নূর মোহাম্মদ যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়েন, তখন তাঁর মা মারা যান। আর যখন পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠেন, তখন তাঁর বাবা মারা যান। নানি তাঁকে মানুষ করেছেন। তাঁর মনে আছে, ছোটবেলা থেকেই কৃষির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। বাবার ধান চাষ দেখে তিনি বাড়ির পাশে ছোট্ট একটু জমিতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ছোট একটি প্লট তৈরি করতেন। সেখানেই বাবার মতো করে ধান রোপণ করতেন, পরিচর্যা করতেন। ধান পাকলে কেটে মাড়াই করতেন। তখন খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলের ধান নষ্ট হয়ে যেত। ফলন ভালো হতো না। এ জিনিসটা ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে দাগ কাটে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বরেন্দ্র ভবনে কৃষকদের একটা প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছিল। তখন তিনি সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন। ওই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আবদুল মজিদ। সেখানে গিয়ে নূর মোহাম্মদ নতুন জাতের ধান সম্পর্কে ধারণা পান। তাঁরা নতুন জাতের ধানের বীজ দিলেন। নূর মোহাম্মদ দেড় বিঘা জমিতে সেই ধান চাষ করলেন। ভালো ফলন হলো। পাশাপাশি দেখা গেল, গ্রামের সাধারণ চাষিদের তাঁর মতো ফলন হয়নি।

এভাবে প্রতি মৌসুমে তিনি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে যান। প্রতিবার পুরোনো বীজ গ্রামের চাষিদের দিয়ে তিনি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে নতুন বীজ এনে রোপণ করেন। এভাবে গবেষণাকেন্দ্রের মতো প্রতিটি ধানের জন্য ছোট ছোট করে প্লট তৈরি করেন। প্রতিটি প্লটে সাইনবোর্ড দিয়ে ধানের নম্বর লিখে দেন। গবেষণালব্ধ ধানের বীজ দিয়ে প্লট তৈরি করে তিনি তার

নাম দিলেন 'শস্য মিউজিয়াম'। এই খবর *প্রথম আলোয়* ছাপা হয়। ধান গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা তাঁর প্লট দেখতে আসতেন। এসব দেখে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধান গবেষণাগারের বীজ দিয়ে তাঁদের মতোই প্লট তৈরি করা দেখে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সাইনবোর্ডের যে খরচ হতো, তা দিয়ে দিতেন। শুধু সাইনবোর্ডের দোকান থেকে রসিদ নিয়ে আসতে হতো। তাঁরা গবেষণার মাঠের মতোই নূর মোহাম্মদের মাঠকে গুরুত্ব দিতেন। তখন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রেজাউল করিম তাঁর মাঠ দেখতে যেতেন।

ব্রি-৩৯ ধান তখনো জাত হিসেবে বাজারে আসেনি। নূর মোহাম্মদ গবেষণাগার থেকে এনে আমন মৌসুমের জন্য ওই ধানের বীজ রোপণ করেন। মাঠে ইঁদুর লেগে ধান খেয়ে নিল। অল্প কিছু ধান হলো। আমনের জাত হলেও তিনি সেই ধান বোরো মৌসুমে আবার রোপণ করেন। কিন্তু বোরোতেও ভালো ফলন হলো। সেই বছর ব্র্যাক একটি হাইব্রিড জাতের বীজ তাঁকে দেয়। দুই ধান পাশাপাশি চাষ করেন। প্রস্তাবিত জাত ৩৯-এর ফলন ভালো হলো। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাঠেও ভালো হলো। পরের বছরই ব্রি-৩৯ ধান জাত হিসেবে বাজারে আসে।

যেভাবে নতুন ধান আবিষ্কার করলেন

আগেই বলেছি, নূর মোহাম্মদ রাজশাহী ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাঠে গিয়ে বসে থাকতেন। দেখতেন, বিজ্ঞানীরা কীভাবে একটি প্রস্তাবিত জাত তৈরি করছেন। একটি মাতৃ গাছের সঙ্গে পিতৃকুলের কীভাবে সংকরায়ণ ঘটান। দেখতে দেখতে তিনি কিছুটা কৌশল আয়ত্ত করেন। যেটুকু বুঝতেন না, বিজ্ঞানীরা তাঁর আগ্রহ দেখে বুঝিয়ে দিতেন। এরপর তাঁর মাটির ঘরটি হয়ে ওঠে গবেষণাগার।

নূর মোহাম্মদ জেনে গেছেন, কখন প্রাকৃতিকভাবে পরাগায়ন ঘটে, তা তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। সাধারণত সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টার মধ্যে পরাগায়ন ঘটে। এই সময় সদ্য শিষ বের হচ্ছে, এমন গাছের ধানের মুখ ফাঁক হয়ে যায়। তখন সেই ধানের ওপরে ছয়টি পরাগদণ্ড থাকে, এগুলো পুরুষ। বাতাসে দোল খেলেই পুরুষ পরাগরেণু নিচে ঝরে পড়ে। নিচে থাকে ওভারি বা মাতৃকুল। এর সঙ্গে পরাগরেণুর মিলনের ফলে ধান হয়। এই মিলন না হলে সেই ধানে চিটা হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এই কাজ কৃত্রিমভাবে করেন। তাঁরা আগে ধানের পিতৃকুল ও মাতৃকুল ঠিক করে নেন। একটি মোটা চালকে যদি সরু করতে চান, তাহলে মোটা চাল যে ধান থেকে হয়, সেই ধানের গাছটিকে মাতৃ গাছ হিসেবে নেন। সরু চালের ধানগাছটি পিতৃকুল হিসেবে নেন। মাতৃকুলের গাছটি টবে নিতে হয়। সংকরায়ণ করার আগের দিন বেলা তিনটার দিকে টবের গাছের সদ্য বের হওয়া ধানের এক-তৃতীয়াংশ কেটে ধানের ছয়টি পুরুষ পরাগদণ্ড ফরসেফ দিয়ে বের করে ফেলে দেওয়া হয়। এবার কাটা ধানটাকে গ্লসি পেপার দিয়ে জড়িয়ে জেমস ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখতে হয়। পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই পিতৃকুলের, অর্থাৎ সরু চালের ধানের গাছের শিষ একটু নিচের দিক থেকে কেটে আনতে হয়। এই শিষের পরাগরেণু যাতে শুকিয়ে না যায়, সে জন্য কেটে আনা ধানগাছটা পানি বা কাদামাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। পরাগায়নের সময় হলে গ্লসি পেপার খুলে কাটা ধানের ওভারি উন্মুক্ত করে এর ভেতরে পুরুষ গাছের পরাগরেণু ঝরিয়ে দিতে হয়। আবার একইভাবে গ্লসি পেপার দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হয়। পরে এই কাটা ধানটিই পাকে। এর সঙ্গে খোসা থাকে না। শুধু চাল থাকে। এই চাল গবেষকেরা শুকিয়ে রাখেন। এটাকে

নূর মোহাম্মদ এভাবে প্রায় ২০০ কৌলিক সারি উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু টাকার অভাবে তিনি বীজ বোর্ডে আবেদন করতে পারেননি

তাঁদের ভাষায় 'এফ-ওয়ান' বলা হয়। অর্থাৎ প্রথম প্রজন্মের সংকরায়িত প্রজাতি।

পরে রোপণ মৌসুমে ওই চালই রোপণ করেন গবেষকেরা। তখন চাল থেকে নতুন গাছ গজায়। এই গাছ থেকে নতুন যে ধান হয়, তাকে গবেষকদের ভাষায় বলা হয় 'এফ-টু'। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের সংকরায়িত প্রজাতি। এই ধান কাটা ও মাড়াইয়ের পর পরের বছর আবার রোপণ করে যে ধান পাওয়া যায়, তাকে 'এফ-থ্রি' বা তৃতীয় প্রজন্মের সংকরায়িত প্রজাতি বলা হয়।

এরপর প্রাথমিক ফলন পরীক্ষার পালা। আরেকবার চাষ করে দ্বিতীয়বার ফলন পরীক্ষা করা হয়। তার পরের বছর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন এলাকায় চাষ করে ফলন পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা হয়, কোন এলাকায় কেমন হলো। রোগবালাই হচ্ছে কি না। তার পরের বছর যে সারির ফলন ভালো হয়, তার ফলন পরীক্ষা করা হয়। তাকেই বলা হয় অগ্রগামী সারির ফলন পরীক্ষা। পরের বছর চাষ করে আবার ফলন পরীক্ষা করা হয়। এবার ধানের ফুল আসার সময় একবার ও পাকার সময় আরেকবার পরীক্ষা করা হয়। ফুল আসার সময় বীজ বোর্ডের কমিটির সদস্যরা পরিদর্শন বইয়ে ফলাফল লিখে রাখেন। পাকার সময় তাঁদের সামনেই কর্তন ও মাড়াই করা হয়, যাতে তাঁরা জানতে পারেন কত দিনে ধান পাকল। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ আছে কি না। এই পরীক্ষাকে বলা হয় প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা (পিভিটি)।

এরপর জাত হিসেবে স্বীকৃতির জন্য বীজ বোর্ডে পাঠানো হয়। পিভিটি করার সময়ই জাতীয় বীজ বোর্ডের কাছে এক হাজার টাকা ফি দিয়ে দরখাস্ত করতে হয়। তারা ১০ জায়গায়

মালয়েশিয়ায় কৃষক-বিজ্ঞানী সম্মেলনে নূর মোহাম্মদ

মালয়েশিয়ায় কৃষক-বিজ্ঞানী সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের গবেষকদের সঙ্গে নূর মোহাম্মদ

এই ধান চাষ করে দেখে। প্রতি জায়গায় চাষ করার জন্য ৩২ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা একসঙ্গে জমা দিতে হয়। জাত হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগপর্যন্ত উদ্ভাবিত নতুন ধানকে বলা হয় 'কৌলিক সারি'।

নূর মোহাম্মদ এভাবে প্রায় ২০০ কৌলিক সারি উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু টাকার অভাবে তিনি বীজ বোর্ডে আবেদন করতে পারেননি। তিনি মনে করেন, তার পাঁচটি কৌলিক সারি জাত হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

রাজশাহী ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, নূর মোহাম্মদের গবেষণা মাঠে তিনি গেছেন। বেসরকারিভাবে তিনি কৌলিক সারি পরিদর্শন করেছেন। কয়েক বছর আগে ধান গবেষণায় পরীক্ষার জন্য তাঁর ধান আনা হয়েছিল। দেখা গেছে, তিনি নিজের মতো করে উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু ইতিহাসটা বলতে পারেন না। এটাই সমস্যা।

দীর্ঘদিন সংকরায়ণ ও বাছাইকরণের মাধ্যমে নূর মোহাম্মদ ধানের আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমের কৌলিক সারি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর সারিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গাছ বেশ মজবুত, সহজে হেলে পড়ে না, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অন্যান্য গাছের তুলনায় অনেক কম, স্বল্প জীবনকাল, উচ্চফলন, সরু, চিকন, সুগন্ধি, খরাসহিষ্ণু, লাল চাল ও কালো চাল। নূর মোহাম্মদ জানান, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে দেশি ধানের উন্নয়ন ঘটিয়ে বা কোনোটার জীবনকাল কমিয়ে বাড়ানো হয়েছে ফলন। খরাপীড়িত বরেন্দ্র অঞ্চলে কম পানিতে, কম সময়ে, কম খরচে ফলানো যায়, এমন ধান নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান। নতুন নতুন, উন্নত ও উচ্চফলনশীল ধান উদ্ভাবন করে সারা দেশের কৃষকদের পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি।

বেসরকারি বারসিকের অ্যাগ্রো-ইকোলজি ও ফুড সিকিউরিটি ইউনিটের পরিচালক এ বি এম তৌহিদুল আলম নূর মোহাম্মদের সঙ্গে গাইড হিসেবে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়ায় কৃষক-বিজ্ঞানী সম্মেলনে বিক্রির জন্য ৪টি ও বিজ্ঞানীদের উপহার দেওয়ার জন্য নিজের উদ্ভাবিত ২০ জাতের ধানের চাল নিয়ে গিয়েছিলেন। উপহার পেয়ে তাঁরা ভীষণ খুশি। পাশাপাশি মালয়েশিয়ার সাবাহ রাজ্যের এক কিষানির কাছ থেকে একটি ধানের জাত নিয়ে এসেছেন তিনি। ওখানে খরাপীড়িত পাহাড়ি এলাকায় এই ধান হতে সময় লাগে ছয় মাস। নূর মোহাম্মদ আশা করছেন, গবেষণা করে এই ধানের জীবনকাল কমিয়ে আনতে পারবেন।

সর্বশেষ গত ২৫ নভেম্বর নূর মোহাম্মদ কর্তন করেছেন কাটারিভোগের চেয়েও সরু ও চিকন ধান। নূর মোহাম্মদের কৃষি পরিষেবা ফার্মের গবেষণা প্লটে এখন ২২টি কৌলিক সারি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। এর মধ্যে তিনি একটি চিকন ও সরু ধানের নাম দিয়েছেন 'নূর ধান-২'। ধান কাটার সময় আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা শামসুদ্দিন মিঞা, সহকারী বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা আবু সাদাত মোহাম্মদ তোয়াব, জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা হুসনা ইয়াসমিন, তানোর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল্লা আহম্মেদ, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আনারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নূর মোহাম্মদ বলেন, কাটার পর সেদিনই ধান মাড়াই করে দেখা যায়, শুকনা ওজনে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫ দশমিক ৮ মেট্রিক টন। বিঘাপ্রতি ফলন ১৯ মণ। চালের হিসাবে হেক্টরপ্রতি ফলন হবে ৩ দশমিক ৮৯ মেট্রিক টন। নূর ধান-২ পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৬ সেন্টিমিটার। গড় কুশির সংখ্যা ১২ দশমিক ৫। ছড়ার গড় দৈর্ঘ্য ২৬ সেন্টিমিটার। এক হাজার পুষ্ট দানার ওজন ১৩ দশমিক ৩৩ গ্রাম। জীবনকাল ১২৫ দিন। নূর মোহাম্মদের দাবি, এটিই এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে সবচেয়ে চিকন ও সরু জাতের ধান।

নূর মোহাম্মদের মতো স্বশিক্ষিত কৃষক-বিজ্ঞানী বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশের কিশোর-তরুণ থেকে এ ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যবসায়ী—সবার অনুপ্রেরণা।

লেখক : সাংবাদিক

গ্যালাক্সির বিবর্তন নিয়ে সেমিনার

আইইউবিতে অনুষ্ঠিত হলো গ্যালাক্সির বিবর্তনবিষয়ক একাডেমিক আলোচনা সভা। গত ২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) নির্মীয়মাণ সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিকসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এটিই এই সেন্টারের প্রথম আলোচনা সভা। এতে বক্তব্য দেন কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টডক্টরাল ফেলো সৈয়দা লাম্মীম আহাদ। আয়োজনটি করেছেন আইইউবির জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সহকারী অধ্যাপক খান মুহাম্মদ বিন আসাদ। সৈয়দা লাম্মীম আহাদের বক্তব্যের বিষয় ছিল—উচ্চ ঘনত্বের পরিবেশে গ্যালাক্সিদের বিবর্তন : হাইড্রোডায়নামিক সিমুলেশন ও বহুতরঙ্গ পর্যবেক্ষণ থেকে উপলব্ধি। এতে প্রায় ৫০ শিক্ষার্থী ও গবেষক অংশ নিয়েছেন।

গণিতের অধ্যাপক কোথায় গবেষণা করেন

কাজী আকাশ

আইনস্টাইনের ধাঁধা বা আইনস্টাইন'স রিডল। বলা হয়, মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এ ধরনের ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন। বাকি ৯৮ শতাংশই ভুল করেন। আপনি কোন দলে? ভালো কথা, মাথা খাটিয়ে সমাধান করলে রয়েছে বিশেষ পুরস্কার! তাহলে, হয়ে যাক!

দেশের নামকরা চার বিজ্ঞানীকে নিয়ে আজকের ধাঁধা। চারজন ভালো বন্ধু, পাশাপাশি বসে গল্প করছেন। তাঁদের বয়স ভিন্ন : ৩৫, ৪০, ৪৭ ও ৫২ বছর। গবেষণা করছেন দেশের নামকরা চার বিশ্ববিদ্যালয়ে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারও গবেষণার বিষয় রসায়ন, কারও পদার্থবিজ্ঞান। কেউ-বা গবেষণা করছেন গণিত বা প্রযুক্তি নিয়ে। তাঁদের পছন্দের খাবারের তালিকাও ভিন্ন। এ তালিকায় রয়েছে কাবাব, খিচুড়ি, বার্গার ও চিকেন ফ্রাই। তাঁদের একজন উল্লিখিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। আমাদের এই গবেষককে খুঁজে বের করতে হবে। সে জন্য রয়েছে ১১টি তথ্য। এগুলো ঘেঁটে উত্তর খুঁজে বের করতে পারেন কি না, দেখুন। তথ্যগুলো হলো :

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রয়েছেন শুরুতে (বাঁয়ে)।
২. যে গবেষকের বয়স ৪০ বছর, তিনি আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের বাঁয়ে কোথাও।
৩. যাঁর কাবাব পছন্দ, তিনি রয়েছেন তৃতীয় স্থানে।
৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের ঠিক বাঁয়ে আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক।
৫. প্রযুক্তি নিয়ে যিনি গবেষণা করছেন, তিনি আছেন সবার শেষে (ডানে)।
৬. তৃতীয় স্থানের গবেষকের বয়স ৪৭ বছর।
৭. জ্যেষ্ঠ গবেষক রয়েছেন সবার শেষে।
৮. পদার্থবিজ্ঞানীর বাঁয়ে যিনি আছেন, তিনি মুরগি খেতে ভালোবাসেন।
৯. যিনি বার্গার খেতে পছন্দ করেন, তাঁর বাঁয়ে আছেন গণিতের অধ্যাপক, তবে তিনি সর্বকনিষ্ঠ নন।
১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের পরেই আছেন ৪০ বছর বয়সী গবেষক।
১১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন।

এবার খুঁজে বের করুন তো : **গণিতের অধ্যাপক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন?**

ধাঁধাটা সমাধান করা খুব সহজ। একসঙ্গে একগাদা তথ্য পড়ে জটিল মনে করবেন না। নিচের ছকের মতো একটি ছক বানিয়ে নিলে সমাধান আরও সহজে করা যায়।

বয়স : ৩৫ বছর, ৪০ বছর, ৪৭ বছর ও ৫২ বছর
পছন্দের খাবার : চিকেন ফ্রাই, বার্গার, কাবাব ও খিচুড়ি
গবেষণা : গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও রসায়ন
বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বৈশিষ্ট্য/স্থান	১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান	৪র্থ স্থান
বয়স				
প্রিয় খাবার				
গবেষণার ক্ষেত্র				
বিশ্ববিদ্যালয়				

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

শীতকালে গাছের পাতা

সাধারণত পরিবেশ হুমকির মুখে না পড়লে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে না। তবে গ্রীষ্মকালেও কিছু গাছের পাতা ঝরে যায়। যে মৌসুমেই পাতা ঝরুক না কেন, কারণ একটাই। পরিবেশের পরিবর্তন। টানা অনেক দিন পরিবেশ গরম থাকার পর হঠাৎ একটু বৃষ্টি হলে মাটির আর্দ্রতা কমে যায়। এমন পরিবেশে গাছ পাতা ঝরিয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মানে গাছ তার দেহে সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকে। আবার বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত গাছ এভাবেই থাকে। ভারী বন্যা বা পানি দূষিত হয়ে গেলেও গাছ একই প্রক্রিয়ায় সুপ্ত অবস্থায় চলে যায়। এ ছাড়া গাছ সংক্রমিত হলে কিংবা ভাইরাস, ছত্রাক বা পোকামাকড়ের কারণে আক্রান্ত হলে পাতা ঝরে পড়ে। সারা বছরই গাছ এমন আক্রমণ বা হুমকির মুখে পড়তে পারে। তখনই গাছ সুপ্ত অবস্থায় গিয়ে নিজেকে রক্ষা করে।

চিরসবুজ কনিফার গাছে সুচ বা আঁশের মতো পাতা থাকে।

পর্ণমোচী গাছের পাতা হয় বড় ও সমতল।

গাছ

পৃথিবীতে প্রধানত দুই ধরনের গাছ আছে। পর্ণমোচী ও চিরসবুজ। শরৎ ও শীতকালে পর্ণমোচী গাছের পাতা ঝরে যায়। তবে চিরসবুজ গাছে সারা বছর একই রকম পাতা থাকে।

বসন্তকাল
শীতে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অনেক গাছের পাতা ঝরে যায়। বসন্তকালে সেসব গাছে নতুন করে ফুল আসে। পাতা গজায়।

গ্রীষ্মকাল
গ্রীষ্মকালে গাছ সূর্যের আলো ও পাতার সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে যতটা সম্ভব মজুত করে রাখে।

ঋতু

বসন্তকালে পর্ণমোচী গাছের পাতা অঙ্কুরিত হয় এবং গ্রীষ্মে সবুজ পাতায় ছেয়ে যায় গাছ। তারপর সূর্যের আলো ব্যবহার করে পাতার সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে। শরৎকালে পাতা ঝরে পড়ার আগে লাল, কমলা ও সোনালি রঙের হয়। শীতকালে গাছে কোনো পাতা থাকে না।

গাছের সুপ্ত অবস্থা

প্রাণীর হাইবারনেশন আর গাছের সুপ্ত অবস্থায় যাওয়া একই কথা। প্রাণীরা যেমন শীত থেকে বাঁচতে হাইবারনেশনে যায়, তেমনি গাছ থাকে সুপ্তাবস্থায়। এ সময় গাছের সব কার্যক্রম চলে খুব ধীরে। গাছভর্তি পাতা থাকা অবস্থায় এরা খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। সুপ্তাবস্থায় গেলে সেগুলো ব্যবহার করে বেঁচে থাকে। কারণ, পাতা না থাকলে গাছ খাদ্য তৈরি করতে পারে না। পাতাবিহীন গাছ মৃত দেখালেও এরা আসলে তখন বিশ্রাম নেয়।

ঝরে পড়ে কেন

বর্ষাকাল

বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির ফলে গাছ দ্রুত বাড়ে। নতুন অঙ্কুর ও শাখার জন্ম হয়। গাছের পাতা রং হয় ঘন সবুজ, থাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত।

শরৎকাল

শরৎকালে দিন ছোট হয়ে আসে, রোদ থাকে কম। পাতাগুলোর রঙের পরিবর্তন হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় পাতা ঝরা।

হেমন্ত ও শীতকাল

হেমন্তে অনেক গাছের পাতা ঝরে যায়। শীতে দিন সবচেয়ে ছোট হয়। মাটি থাকে ঠান্ডা। গাছ তখন প্রায় সব পাতা হারায়।

আজ আ সায়েন্টিস্ট অবলম্বনে **কাজী আকাশ**

পেট্রোলিয়াম জেলি কীভাবে আর্দ্রতা রক্ষা করে

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

শীতকালে ঠোঁট ফেটে যাওয়া, খসখসে ত্বক বা কনুইয়ে শুকনা ভাব—এসব খুব সাধারণ বিষয়। শীতের সময় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। সে জন্যই ত্বক এ রকম শুকিয়ে যায়, ফেটে যায়। এই বিপদের ওষুধও আমাদের সবার জানা। পেট্রোলিয়াম জেলি। শীতের মৌসুমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পেট্রোলিয়াম জেলির বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির হয়। এসব বিজ্ঞাপন দেখে পেট্রোলিয়াম জেলিকে কেউ যদি রাতারাতি জাদুমন্ত্র বলে ভেবে বসেন, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই! কিন্তু পেট্রোলিয়াম জেলি আসলেই কি ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করে? নাকি এটা শুধুই মার্কেটিং স্টান্ট?

পেট্রোলিয়াম জেলি মূলত একধরনের হাইড্রোকার্বন যৌগ। আরেকটু সঠিকভাবে বললে, উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন যৌগ। অপরিশোধিত তেল থেকে এই হাইড্রোকার্বন তৈরি করা হয়। ১৮৫৯ সালে রবার্ট চেসব্রো নামের এক মার্কিন বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন।

আমরা যখন ত্বকে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করি, তখন এটি ত্বকের ওপর একটি পাতলা স্তর তৈরি করে। ফলে ত্বকের আর্দ্রতা বাইরের পরিবেশে মিলিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ এটি ত্বকের নিচে থাকা প্রাকৃতিক আর্দ্রতা আটকে রাখে। কীভাবে?

আমাদের দেহকোষে থাকা পানির কারণে ত্বকে প্রাকৃতিকভাবেই আর্দ্রতা তৈরি হয়। গরমের সময় বাতাসের জলীয় বাষ্প, অর্থাৎ আর্দ্রতা বেশি থাকে। ফলে গরমে ত্বকের আর্দ্রতা শুকায় না। কিন্তু শীতের দিনে বাতাসে আর্দ্রতা কমে যায়। কারণটা বোঝা খুব সহজ। বাতাসে পানি বা আর্দ্রতার পরিমাণ ত্বক থেকে কম, তাই পানি বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। সে জন্যই শুষ্ক বাতাসে ত্বক দ্রুত আর্দ্রতা হারায়। ফলে শুকনা পাতার মতো ত্বকের বাইরের কোষ ঝরে পড়তে শুরু করে। ঠোঁটের মতো স্পর্শকাতর ত্বকের যেসব অংশে পেশির চাপ বেশি থাকে, সেখানে ফেটে যায়। কিন্তু পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করলে এটি ত্বকের ওপরে একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে। এই স্তর ত্বকের পানি বাষ্প হয়ে বাইরে চলে যাওয়া ঠেকায়। ফলে ত্বক বেশি সময় ধরে নরম ও মসৃণ থাকে।

অনেকে মনে করেন, পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকে আর্দ্রতা জোগায়। ধারণাটা ভুল। পেট্রোলিয়াম জেলি ময়েশ্চারাইজার বা আর্দ্রকারী প্রসাধনসামগ্রী নয়। অর্থাৎ সরাসরি ত্বকে আর্দ্রতা জোগায় না। বরং ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা ধরে রাখে। এর মানে হলো, ত্বক যদি আগে থেকেই শুষ্ক হয়ে থাকে, তাহলে পেট্রোলিয়াম জেলি খুব একটা কাজ করে না। সে ক্ষেত্রে ত্বককে আর্দ্র কীভাবে করা যায়, তা জানতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

অনেকে মনে করেন, পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকে আর্দ্রতা জোগায়। ধারণাটা ভুল। পেট্রোলিয়াম জেলি ময়েশ্চারাইজার বা আর্দ্রকারী প্রসাধনসামগ্রী নয়

পেট্রোলিয়াম জেলি শুধু আর্দ্রতা রক্ষা করে না, এটি ত্বকের সুরক্ষায়ও কাজ করে। ঠান্ডা বা গরম আবহাওয়ায় ত্বক রুক্ষ হয়ে পড়লে কাজ করে আরামদায়ক প্রলেপ হিসেবে। এমনকি ছোটখাটো কাটাছেঁড়া বা পোড়া জায়গায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে ক্ষতের ওপর নতুন কোনো ধুলাবালু পড়ে না। তবে মনে রাখা জরুরি, ক্ষতস্থানে এটি ব্যবহার করার আগে জায়গাটি অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। না হলে ধুলা-ময়লা বা জীবাণু আটকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বলা বাহুল্য, এটি অ্যান্টিসেপটিকের বিকল্প নয়। বরং হাতের কাছে অ্যান্টিসেপটিক না থাকলে প্রাথমিকভাবে ছোটখাটো কাটায় যেন ধুলাবালু না পড়ে, সে জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

পেট্রোলিয়াম জেলি একটি তৈলাক্ত রাসায়নিক। অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ত্বকে ভারী, চটচটে অনুভূতি হতে পারে। ব্রণপ্রবণ ত্বকে এটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এটি ত্বকের ছোট ছোট ছিদ্র বন্ধ করে ব্রণ বাড়িয়ে দিতে পারে, এমনটাই মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

লেখক : শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র : ওয়েবএমডি, মেডিকেল নিউজ টুডে, উইকিপিডিয়া

বিগ ডেটার কর্মশালা আয়োজিত

ষষ্ঠ রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মারক বক্তৃতার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে শেষ হলো বিগ ডেটার জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক কর্মশালা। ২৪ নভেম্বর, রোববার ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এ কর্মশালা আয়োজিত হয়। এতে বক্তব্য দেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গবেষক সৈয়দা লামমীম আহাদ ও রুসলান ব্রিলেনকোভ। মোট দুই অংশে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিগ ডেটার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী। প্রথম অংশে লামমীম আহাদ মহাবিশ্বের জটিল প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দেন। ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির প্রকৃতি, গ্যালাক্সির বিবর্তন এবং বহির্জাগতিক জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। আর দ্বিতীয় অংশে বিগ ডেটার কার্যকর ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করেন ব্রিলেনকোভ।

চট্টগ্রামে বিজ্ঞানে নোবেল বক্তৃতা

চট্টগ্রামে আয়োজিত হলো 'এসপেরিয়া নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা'। গত ৩০ নভেম্বর, শনিবার জিয়া স্মৃতি জাদুঘর (পুরাতন সার্কিট হাউস) মিলনায়তনে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে চলতি বছরের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ও তাঁদের কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয় এতে। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক সুমিত মজুমদার; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক মো. মাহবুব হাসান; বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানী মো. মুরশেদ হাসান সরকার; নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হকসহ অনেকে। ২০২৪ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কারা পেলেন এবং কেন পেলেন, তা নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

বাংলা একাডেমিতে বিজ্ঞান সেমিনার

বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদার ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজিত হলো। ১ ডিসেম্বর, রোববার রাজধানীর বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চায় গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে কুদরাত-এ-খুদাকে নিয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিজ্ঞানবক্তা আসিফ। এ ছাড়া আলোচক হিসেবে ছিলেন কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক সুব্রত বড়ুয়া। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির সহপরিচালক মাহবুবা রহমান।

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক

কার্যকারণ

আব্দুল কাইয়ুম

পানির ফোঁটা গোল কেন

বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, বৃষ্টির ফোঁটা গোল। আবার খুব জোরে বৃষ্টি নামলে ফোঁটাগুলো অনেকটা যেন মোমবাতির হালকা শিখার মতো আকার ধারণ করে। আমরা জানি, পড়ন্ত বস্তু ওজন হারায় বলে বৃষ্টির ফোঁটা গোল। কিন্তু কথাটির অর্থ কী? অর্থ হলো, যেকোনো তরল পদার্থ তার সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠটানের জন্য সব সময় সবচেয়ে কম আয়তনের আকৃতি ধারণ করতে চায়। আর কিছু তরল পদার্থ গোলাকার হলেই কেবল সবচেয়ে কম আয়তনের আকার ধারণ করতে পারে। যখন বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে, সেটি ওজন হারায়; ফলে ওজনহীন অবস্থায় সেই তরল ফোঁটাগুলো সবচেয়ে কম আয়তন—গোলাকার ধারণ করে। এখানে অবশ্য পড়ন্ত অবস্থায় এর ওপর বাতাসের চাপ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বৃষ্টি বেগবান হলে পড়ন্ত বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর ওপর বাতাসের চাপ বেড়ে যায়। তখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটু লম্বাটে গোল হয়।

হাই তুললে চোখে পানি আসে কেন

শিক্ষক একটানা পড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ওদিকে ভয়ও করছে। স্যার হয়তো ধমক দেবেন। এ অবস্থায় হাই আসছে। সবাই মিটি মিটি হাসছে। স্যারও দেখছেন। কী করা যায়? কিছু করার নেই। হাই তোলার কারণে মুখের বিভিন্ন পেশি সংকুচিত হয়। সবাই তাকাবেই। এ সময় চোখের অশ্রুগ্ল্যান্ডের ওপর চাপ পড়ে। এ জন্যই হাই তুললে চোখে পানি আসে। এটি কান্না বা আবেগের কারণে নয়। স্রেফ পেশির টানে চোখে পানি এসে যায়।

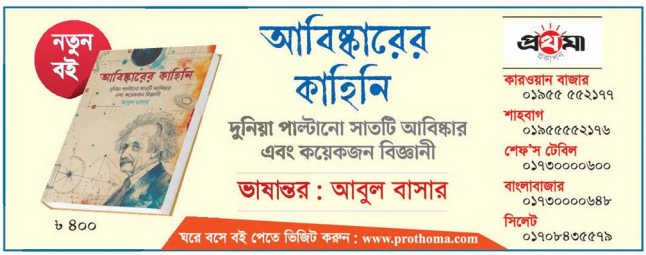

প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান

উত্তর দিচ্ছেন সম্পাদক **আব্দুল কাইয়ুম**

প্রশ্ন : মহাশূন্যে কীভাবে মুঠোফোনে কথা চলে?

উত্তর : কঠিন প্রশ্ন। শুধু মহাশূন্যে কেন, রাস্তায় চলাচল, গাড়িতে যাতায়াত বা খোলা মাঠে বসেও তো আমরা মুঠোফোনে একান্তে কথা বলি। স্থান-কাল-পাত্রনির্বিশেষে মুঠোফোনে কথা চলে। এমনকি বিশেষ ব্যবস্থায় মহাশূন্যেও মুঠোফোনে কথা চলতে পারে। কীভাবে?

আগে এটা সম্ভব ছিল না। বছর দশেক আগে নাসা তাদের ফোনস্যাট (PhoneSat) প্রোগ্রামের আওতায় মহাশূন্যে স্যাটেলাইট ফোন চালু করে। প্রথম দিকে এ ধরনের ফোনের সক্রিয়তা শুধু স্যাটেলাইটের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর বাইরে ভূপৃষ্ঠের সেল টাওয়ারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে কাজ চালানো যেত না। এখন চলে। সাধারণত স্যাটেলাইটভিত্তিক মোবাইল কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় সংকেত আদান-প্রদানের মাধ্যমে মহাশূন্যে মুঠোফোনে কথা চলে। ক্রমান্বয়ে এ ধরনের ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। এখন মহাকাশে বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে মোবাইল যোগাযোগ সম্ভব।

প্রশ্ন : ট্যাব নাকি বই, কোনটি বেশি দরকার?

উত্তর : এখন ডিজিটাল যুগে সবার হাতে হাতে ট্যাবলেট পিসি বা ট্যাব। আটকাবে কে? সম্ভব না। স্মার্টফোনের ভেতরেও ডিজিটাল ট্যাবের বিভিন্ন ফিচার পাওয়া যায়। ছাপা বই পড়াশোনার চর্চা তো চলবেই, তবে ট্যাবও এখন সবার হাতে

হাতে চলে এসেছে। একে ডিজিটাল বইও বলতে পারেন।

আসলে দুটিরই দরকার আছে। কিন্তু কোনটার পেছনে বেশি সময় দেওয়া দরকার? এটি এখন বড় প্রশ্ন। বিশেষভাবে দেখা যায় শিশুরা, এমনকি দু-তিন বছরের শিশুও ডিজিটাল ট্যাবে সারাক্ষণ ডুবে থাকে। বইয়ের চেয়ে ট্যাব তাদের বেশি টানে। অভিভাবকেরা অনেক সময় হয়তো মনে করেন, এটা তো ভালোই। শিশুরা ডিজিটাল যুগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করছে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ *জামা পেডিয়াট্রিকস ম্যাগাজিন*-এ বিষয়টি নিয়ে তাঁদের গবেষণাভিত্তিক নতুন কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। এটি আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা। তাদের সাপ্তাহিক অনলাইন ও মাসিক ছাপা পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হয়। প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধে বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যম অতিরিক্ত ব্যবহার করলে শিশুদের মনের বিকাশে বাধা এবং ঘুমের সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। কারণ, মুঠোফোনে বা ট্যাবে চট করে কার্টুন ও কমিকস দেখা সম্ভব, এতে তাদের অনেক সময় নষ্ট নয়। কল্পনাশক্তিও সেভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কাছে প্রশ্ন লিখে পাঠান। আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন কিংবা ই-মেইল করুন। খামের ওপর অবশ্যই 'কার্যকারণ' কথাটি লিখবেন। অথবা ই-মেইল পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় : editor@bigganchinta.com

সুডোকু ৪৫

সুডোকু বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক ধাঁধা। বুদ্ধির ব্যায়াম করতে, নিউরনের ক্ষমতা বাড়াতে কিংবা সময়কে আনন্দময় করতে এই জাপানি ধাঁধা সহায়ক হতে পারে। প্রতিটি কলাম ও সারিতে ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক মাত্র একবার বসাতে হবে। তেমনি প্রতিটি ৩×৩ বর্গক্ষেত্রের ভেতরেও ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক একবার বসবে। নিচের সুডোকুটি পূরণ করুন। উত্তর দেখুন অন্য পাতায়।

সুডোকু ০১

				৩		৬		
১							৮	
		৬		৪				১
	৭				২		৪	৬
	৪	৫				১	২	
২	৮		১				৯	
৮				৯		২		
	৬							৫
		৯		২				

সুডোকু ০২

						৭		১
			৮		১		৪	
১				৩			৬	৮
		৭	৯					৪
	২			৪			৭	
৪					৩	২		
৬	৮			২				৫
	১		৫		৪			
৯		৪						

সংখ্যা দুটির মধ্যে কোনটি বড়

আব্দুল কাইয়ুম

আমরা জানি, একটি ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল ঋণাত্মক হয়। কিন্তু দুটি সংখ্যাই যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে তো গুণফল ধনাত্মক হয়ে যায়। কেন ঋণাত্মক সংখ্যা দুটির গুণফল এভাবে চট করে একেবারে বিপরীতধর্মী তথা ধনাত্মক হয়? সাধারণ গণিতের একটি চমৎকার যুক্তি দিয়ে আমরা এটা ব্যাখ্যা করতে পারি। বলতে পারি যে দুটি ঋণাত্মক সংখ্যার গুণফল ধনাত্মক হবে।

দেখুন কেন :

আমরা জানি, গণিতের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী :

$-১ \times ২ = -২$

$-১ \times ১ = -১$

$-১ \times ০ = ০$

এরপর, $-১ \times -১ = ?$

এর উত্তরে আমরা বলতে পারি গুণফল = ১। কারণ, আমরা ওপরের চার সারির গুণফল প্রতিটি পূর্ববর্তী গুণফলের সঙ্গে (+১) যোগ করে পেয়েছি। সুতরাং একই ধারায় তৃতীয় গুণফল শূন্যের সঙ্গে +১ যোগ করলেও আমরা একই ধারার চতুর্থ গুণফলটি পাব। আমরা দেখছি, চতুর্থ সারির ক্রমিক পর্যায়ের গুণফলটি হতে পারে : $(-১ \times -১) =$ পূর্ববর্তী গুণফল ০-এর সঙ্গে ১ যোগ করে : $(০ + ১) = ১$। পাটিগণিতের সাধারণ নিয়মেই এই ফলাফল আমরা পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমরা '(মাইনাসে মাইনাসে প্লাস) এই উত্তর পেয়েছি। আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায়ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে পরপর দুবার না বললে শেষ পর্যন্ত উত্তরটি 'হ্যাঁ' বলে গণ্য হয়। যেমন বললাম, 'গতকাল শরীর ভালো ছিল না, কিন্তু আজ আর খারাপ না।' অর্থাৎ আজ ভালো। উত্তর 'হ্যাঁ-বাচক' বলে ধরে নেওয়া যায়।

এ মাসের ধাঁধা

বলুন তো ৮° বড়, না ১৬°?

গত সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধার উত্তর

ধাঁধাটি ছিল এ রকম : তিন অঙ্কের একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে ৩ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৩ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য, ৪ বিয়োগ করলে ৪ দিয়ে এবং ৫ বিয়োগ করলে ৫ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। সংখ্যাটি কত?

উত্তর : সংখ্যাটি ১২০

কীভাবে উত্তর বের করলাম

প্রথমে ৩, ৪ ও ৫ এর ল.সা.গু বের করি। ল.সা.গু $৩ \times ৪ \times ৫ = ৬০$। তাই ৬০ থেকে পর্যায়ক্রমে ৩, ৪ বা ৫ বিয়োগ করলে বিয়োগফলগুলো যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। সুতরাং এ রকম শর্ত পূরণ করে যে সংখ্যাগুলো, তাদের মধ্যে লঘিষ্ঠ বা ন্যূনতম সংখ্যাটি ৬০। কিন্তু আমাদের দরকার তিন অঙ্কের সংখ্যা। এখন ৬০-কে ২ দিয়ে গুণ করি। $৬০ \times ২ = ১২০$। এটি ৩ অঙ্কের সংখ্যা। সুতরাং এটিই তিন অঙ্কের ন্যূনতম সংখ্যা, যা প্রদত্ত শর্ত পূরণ করে।

আগস্ট সংখ্যার সঠিক ১০ উত্তরদাতা

শেখ ফাবিয়া আমিন, মিরপুর, ঢাকা
আব্দুল্লাহ আল ওয়াহিদ, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ
নাহিদ রানা, বাউন্ডারি রোড, ময়মনসিংহ
তানজিম মাহফুজ, উপশহর, নাটোর
রাজিব কাজী, লাখিরপাড়, গোপালগঞ্জ
সুনন্দা মৈত্রি, কাজীপাড়া, ঢাকা
মোহাম্মদ রিজওয়ান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
আব্দুল্লাহ আল আহাদ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম
রেশমা আক্তার, ধূয়াসার, মাদারীপুর
দিপ্তী শর্মা, খিলগাঁও, ঢাকা

পাঠক যখন লেখক

হয়তো আপনার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের বিজ্ঞান লেখক। হয়তো আপনি চাইছেনও কিছু একটা লিখতে। তবে দেরি কেন, ৫০০ শব্দের ভেতর লিখে ফেলুন বিজ্ঞান বা গণিতবিষয়ক কোনো ফিচার কিংবা মজার তথ্য। পাঠাতে পারেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের খবরও। তবে যা-ই লিখুন, সেটাতে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং সূত্রটা থাকে ঠিকমতো। তারপর লেখাটা পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার দপ্তরে। মানসম্মত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইন বা প্রিন্ট সংস্করণে। লেখা পাঠাতে পারেন—editor@bigganchinta.com ঠিকানায়। অথবা লেখা অ্যাটাচ করে দিতে পারেন facebook.com/bigganchinta এই পেজের ইনবক্সেও। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।

রসায়ন কুইজ ৯৬

১. কক্ষ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে নিচের কোন ধাতু?

ক. সোনা
খ. পারদ
গ. তামা

২. অ্যাসিড ও ক্ষারের মিশ্রণে কী উৎপন্ন হয়?

ক. পানি ও লবণ
খ. অ্যামোনিয়া
গ. নাইট্রোজেন

৩. বিশুদ্ধ সোনার সংকেত কী?

ক. Au
খ. Ag
গ. Si

রসায়ন কুইজ ৯৫-এর উত্তর

১. খ. লোহায় মরিচা ধরা
২. গ. পানি
৩. খ. NaCl

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ৯৬

১. একটা বল মাটিতে পড়ে আবার ফিরে আসার কারণ কী?

ক. ভরবেগ
খ. গতি
গ. স্থিতিস্থাপক শক্তি

২. লোহা পোড়ালে গরমে ফুলে ওঠে। এর কারণ কী?

ক. চাপ কমে
খ. তাপের সম্প্রসারণ
গ. বাতাস ঢুকে যায়

৩. ভরের আন্তর্জাতিক একক কী?

ক. গ্রাম
খ. টন
গ. কিলোগ্রাম

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ৯৫-এর উত্তর

১. ক. রেডিও তরঙ্গ
২. গ. নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই
৩. খ. বেগুনি আলো

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ৯৬

১. আলোকবর্ষ কিসের একক?

ক. সময়ের
খ. ভরের
গ. দূরত্বের

২. পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণ কত?

ক. ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^2
খ. ১০ মিটার/সেকেন্ড^2
গ. ৮.৮ মিটার/সেকেন্ড^2

৩. বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল মহাকাশ মিশনের নাম কী?

ক. অ্যাপোলো প্রোগ্রাম
খ. স্পেস শাটল প্রোগ্রাম
গ. জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ৯৫-এর উত্তর

১. গ. বৃহস্পতি
২. ক. স্পুতনিক ১
৩. খ. ইউরোপা

প্রতিটি কুইজের উত্তর আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। না হলে উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। একই খামে একাধিক কুইজ পাঠানো যাবে। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন রকমারি.com-এর সৌজন্যে ৩০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

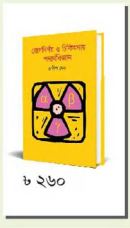

৳ ২৬০

রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় পদার্থবিজ্ঞান

প্রদীপ দেব

রোগনির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করি—তার বেশির ভাগই এসেছে পদার্থবিজ্ঞান থেকে। এসব প্রযুক্তির পেছনের পদার্থবিজ্ঞান সহজ-সরল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ে।

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন : www.prothoma.com

প্রথমা

কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০ ০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০ ০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

জীববিজ্ঞান কুইজ ৯৬

১. জীবজগতে প্রোটিন উৎপাদনের মেশিন বলা হয় কোন অঙ্গকে?

ক. মাইটোকন্ড্রিয়া
খ. রাইবোজোম
গ. ক্লোরোপ্লাস্ট

২. কোন ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?

ক. ভিটামিন এ
খ. ভিটামিন কে
গ. ভিটামিন সি

৩. লুই পাস্তুর কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন?

ক. ইলেকট্রোডায়নামিকস
খ. জেনেটিকস
গ. জীবাণু তত্ত্ব

জীববিজ্ঞান কুইজ ৯৫-এর উত্তর

১. খ. কোয়ালা
২. খ. লোহিত রক্তকণিকা
৩. খ. ব্রোমেলিয়াড

প্রযুক্তি কুইজ ৬৮

১. কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ডেটা স্থানান্তর করা সম্ভব?

ক. ব্লুটুথ
খ. ওয়াই-ফাই
গ. ইউএসবি

২. কোন প্রযুক্তি ব্যবহারে ড্রোন কাজ করে?

ক. রেডিও তরঙ্গ
খ. ইনফ্রারেড
গ. স্যাটেলাইট

৩. ইতিহাসের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার কে?

ক. চার্লস ব্যাবেজ
খ. আডা লাভলেস
গ. অ্যালান টিউরিং

প্রযুক্তি কুইজ ৬৭-এর উত্তর

১. গ. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব
২. ক. ফোরট্রান
৩. খ. ১৯৭১ সালে

বিজ্ঞানচিন্তার গ্রাহক হোন

এক বছর বা ছয় মাসের গ্রাহক হয়ে

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন

বিজ্ঞানচিন্তা

গ্রাহক হতে ফোন করুন নিচের নম্বরে
০১৭০৮৪১১৯৯৬

ডেলিভারি চার্জ ছাড়া ঘরে বসে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন :
prothoma.com

বিজ্ঞানচিন্তা

বিজ্ঞানচিন্তার নভেম্বর সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

গত সংখ্যার সব বিভাগের কুইজের উত্তর অনেকেরই সঠিক হয়েছে। তবে লটারির মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে ১৫ জন বিজয়ীকে বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ৩০০ টাকার বই। বিজয়ীদের অভিনন্দন।

সৌজন্যে
অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স
বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স কিট

রসায়ন কুইজ ৯৫

জান্নাতুল ফেরদৌস
বিডি আর রোড, লালমনিরহাট

ফাবিহা নূর
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ৯৫

সামিরা তাসনিম
হাফরাস্তা, নাটোর

হুমায়রা আক্তার
মিঠাপুকুর, রংপুর

অমিত উজ্জ্বল
বাকলীয়া, চট্টগ্রাম

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ৯৫

সায়মা রহমান
শালগাড়িয়া, পাবনা

মুহাইমিনুল ইসলাম
মদনগঞ্জ বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

স্নেহা তাসনীম
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর

জীববিজ্ঞান কুইজ ৯৫

স্যালভীনা রহমান
বাগেরহাট, খুলনা

নূর হাসনাত পরশ
চূড়খাই, ময়মনসিংহ

মো. মাশরাফী পাঠান
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

প্রযুক্তি কুইজ ৬৭

তাওফিকা আনোয়ার
চাউলিয়া, দিনাজপুর

নাবিল ইসরাত জিসা
রেজিস্ট্রি পাড়া, টাঙ্গাইল

সাবরিনা তাহসিন
জুবিলী, ময়মনসিংহ

Aarong Dairy
Milk for Good
Aarong Dairy
Mango Milk Drink
UHT
200 ml
মজায় মজায় খেলাটাই
Aarong Dairy
Chocolate Milk Drink
UHT
200 ml
Aarong Dairy
Mango Milk Drink
UHT
200 ml
Aarong Dairy
VANILLA
MILK DRINK
UHT
Aarong Dairy
Strawberry Yogurt Drink
UHT
200 ml

তীর
১৯৭২
citygroup
৫২
বছর
উৎকর্ষের প্রেরণায়
মমতায় বাড়াই
সম্পর্কের গভীরতা
৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কগুলোকে মমতায় ঘিরে রেখেছে তীর।
তাইতো সরিষার তেল থেকে শুরু করে রেডি মিক্স পর্যন্ত সবকিছুতেই
বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কখনোই আপস করেনি তীর।
ভিডিওটি দেখতে স্ক্যান করুন
www.citygroup.com.bd /TEER1972